গণবিজ্ঞান ভাবনার পত্রিকা

বিজ্ঞান অন্বেষক

BIGYAN ANNESWAK

বর্ষ-১৬ সংখ্যা-৩ মে-জুন ২০১৯ RNI NO. WBBEN/2003/11192 মূল্য : ৫ টাকা

গোকুলানন্দ খুন ১৯৯৯

নিগমানন্দ সরস্বতী
অনশনে বলিদান ১৩.০৬.১১

বাবা নাগনাথ
অনশনে বলিদান ১০.০৭.১৪

নদী ও মানুষ

জগন্ময় মজুমদার

নদী বললো শাখাকে
শাখানদী বললো প্রশাখাকে : চল্

সবাই গাছে দেখে হিমবাহ গলতে শুরু করে
জল শুধু অবক্ষয়ে সম্বল।

বিদুরের খুদের মতো উৎসমুখ খুলে দেয়
অতল পাতাল...

সমুদ্রে গিত থাকতে সবাই চলছে
নদী শুকোচ্ছে,
শাখানদী, উপনদী, হ্রদ...

তেলা মাথায় তেল দেওয়া প্রবৃত্তির আরেক প্রবৃত্তি।

হে মানুষ,
তুমিও তো নদীর উপরে বাঁধ দিয়ে
নিজেই নিজের পায়ে দিচ্ছো কুড়াল!

নদীর জন্য শহিদ

জ্ঞানস্বরূপ সানন্দ
অনশনে বলিদান ১১.১০.১৮

আত্মবোধানন্দ
অনশনে অবস্থান ২৪.১০.১৮-০৪.০৫.১৯

□ প্রচ্ছদ কথা ১ : চাই— 'অবিরল ও নির্মল গঙ্গা' ২ □ প্রচ্ছদ কথা ২ : গঙ্গাদূষণ : বেনারসের অবস্থা ৪ □ নতুন গবেষণা ৫ □ পরিবেশ বিপর্যয় ৬ □ বিজ্ঞান, অপবিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতা ৮ □ ধোঁয়াটে কাচ ৯ □ অঙ্ক ১০ □ স্বাস্থ্য : চোখের বালি— দূষণ কিভাবে দৃষ্টি নষ্ট করছে ১১ □ যারা হারিয়ে যাচ্ছে ১২ □ সংবাদ ১২ □ মহাকাশ : কৃষ্ণ-গহ্বর : স্বপ্নপূরণ ১৪ □ জানো কি? কার্টুন ১৬

সুভাষিতম্

'নিজে নিজেকে জানো।' —*সক্রেতিস*

আমাদের কথা : কেন চেয়ে আছো গো মা?

গঙ্গা আমাদের মা। তবু প্রতিদিন আমাদেরই শরীর নিঃসৃত রেচন পদার্থ তাঁর বক্ষে নিক্ষেপ করছি।

গঙ্গা আমাদের মা। তবু কি করে আমাদের তৈরি কারখানার দূষিত বর্জ্য তার বুকে ঢেলে দিচ্ছি?— কি করে অসংখ্য সেতু বাঁধ দিয়ে তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে শৃঙ্খলিত করছি?

গঙ্গা আমাদের মা। কি করে প্রাণ রক্ত সম জল তাঁর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আমাদের সাধ মেটাচ্ছি?

এই রকম জীবনদায়ী সকল নদীই আমাদের মা। আমাদের নির্মম অত্যাচারে তাঁদের প্রাণ সংশয়। তাঁদের অস্তিত্বই বিলুপ্ত প্রায়।

এই প্রেক্ষিতে প্রশ্ন— আমরা কী নদীর প্রকৃত সন্তান? নদীকে 'মা' বলে ডাকার অধিকার কি আমাদের আছে?

ছবি : বেণু সেন

অন্যদিকে নদীর প্রকৃত সন্তানদের পাবেন হরিদ্বারের মাতৃসদন আশ্রমে। সেখানে গোকুলানন্দ, নিগমানন্দ, নাগনাথ, স্বরূপ সানন্দ 'নির্মল ও অবিরল গঙ্গা'র জন্য দীর্ঘদিন অনশনে নিজেদের জীবন দিলেন। 'মা'-র জন্য শহিদ হয়ে গেলেন। এখনও সেখানেই আত্মবোধানন্দের মতো সন্তানেরা অনশনের মাধ্যমে নিজেদের জীবন বলিদানের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

এখন আমরা কি করব? মা ও তাঁর প্রকৃত সন্তানদের 'মৃত্যু দৃশ্য' থেকে মুখ ঘুরিয়ে নেব?

—তাপস মজুমদার

প্রচ্ছদ কথা ১

তাপস বিশ্বাস

চাই— 'অবিরল ও নির্মল গঙ্গা'

একথা অজানা নয় যে পৃথিবীর তিনভাগ জল এবং এক ভাগ স্থল। একথাও অজানা নয় যে পৃথিবীর মোট জলের ৯৭.২ শতাংশই সামুদ্রিক বা লবণাক্ত জল। বাকী ২.৮ শতাংশ হল পানের যোগ্য বা মিস্টি জল। তবে একথা জানলে হয়তো একটু চিন্তা আমাদের মনকে বিব্রত করবে যে ২.৮ শতাংশ মিষ্টি জলের বেশির ভাগই রয়েছে বরফ রূপে যা ক্রমবর্দ্ধিত হারে গলছে এবং সেই গলিত জল মিশছে সমুদ্রের জলে। বাকি জলের কিছুটা রয়েছে বায়ুমণ্ডলে এবং অবশিষ্ট এক শতাংশেরও কম পানীয় জল রয়েছে নদী ও বিভিন্ন জলাশয়ে এবং ভূমিতে যাকে ভূজল বলা হয়, যার ওপর সকল জীবের জীবনধারণের অন্যতম নির্ভরতা।

প্রাকৃতিক এই মূল্যবান সম্পদের ধ্বংস এবং লুণ্ঠনের স্বার্থান্বেষী প্রয়াস আর তার বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের জীবন যুদ্ধের সুদীর্ঘ ইতিহাসে বিশেষ করে পরিবেশ আন্দোলনে অতি সাম্প্রতিক সংযোজন গঙ্গানদীকে এবং তার উপর নির্ভরশীল জীবজগতকে রক্ষা করতে হরিদ্বার মাতৃসদন আশ্রমের সন্ন্যাসীদের বিগত প্রায় তিন দশকের অনশন আন্দোলন। যা পরিবেশ আন্দোলনকে প্রদান করেছে নতুন দিশা। খুলে দিয়েছে ভাবনার প্রসারের নতুন এক জানালা।

উত্তর ভারতের উত্তরাখণ্ড রাজ্যের হরিদ্বার থেকে কংখল পর্যন্ত গঙ্গা নদী বরাবর যে কুম্ভক্ষেত্র তার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং চরিত্রকে রক্ষা করতে ১৯৯৭ সালে স্বামী শিবানন্দ মহারাজ স্থাপনা করেন এই আশ্রম, নাম মাতৃসদন। তার আগেই শুরু হয়ে গিয়েছিল কুম্ভক্ষেত্রকে বালি, কয়লা এবং পাথর খাদানে পরিণত করা মাফিয়াদের বিরুদ্ধে অনশন আন্দোলন। শুরু হয়েছিল অনশন ও আত্মবলিদানের এক বিষন্ন পর্যায়। একে একে আত্মবলিদানের মাধ্যমে মৃত্যুকে জয় করলেন স্বামী গোকুলানন্দ, বাবা নাগনাথ, স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী। মৃত্যুকে উপেক্ষা করে আন্দোলনের প্রবাহ অবিরল চলতে থাকল। যদিও আন্দোলনের পরিসর ছিল উত্তরাখণ্ডেই সীমাবদ্ধ।

এবার উদ্ঘাটিত হল আন্দোলনের এক নবপর্যায়। আন্দোলনে যুক্ত হলেন ভারতের পরিবেশবিদদের অন্যতম প্রোফেসর গুরুদাস আগরওয়াল। সন্ন্যাস গ্রহণের পর যিনি পরিচিত হলেন স্বামী জ্ঞানস্বরূপ সানন্দ নামে। বয়সে ৮৬ বছর। তিনি ১১২ দিন অনশন করেছিলেন। তিনি ছিলেন এই দেশের প্রথম Environmental Engineer। তিনি ছিলেন Kanpur IIT-র প্রাক্তন অধ্যাপক। সকল পরিবেশ বিজ্ঞানীর কাছে তিনি ছিলেন পরামর্শদাতা এবং পথপ্রদর্শক। তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের Member Secretary। তিনি প্রমাণ করেছিলেন গঙ্গানদীর স্বশুদ্ধিকরণ (Self-Oxydisation) বৈশিষ্ট্যের কথা। যাকে তিনি বলতেন গঙ্গত্ব। তিনি প্রমাণ করেছিলেন গঙ্গাজলে Colifage নামক Positive Bacteria-র কথা যা ১৭ থেকে ২০ রকমের Coliform কে বিনষ্ট করতে সক্ষম। তিনি কি চেয়েছিলেন? 'গঙ্গানদীকে অবিরল বইতে দাও'— এটুকুই তার চাওয়া।

২০১০ সালে উত্তরাখণ্ডে গঙ্গানদীর ওপর জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের প্রতিবাদে তিনি প্রথম অনশনে বসেন এবং তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকারকে বাঁধের কাজ বন্ধ করতে বাধ্য করেন।

কেন্দ্রে নতুন সরকার এসে উত্তরাখণ্ডে পুনরায় সে কাজ শুরু করে এবং সাথে আরও একাধিক বাঁধ দেওয়ার সরকারি কর্মকাণ্ডের ঘোষণা করে। প্রতিবাদে ২২ জুন ২০১৮ সালে স্বামী সানন্দ পুনরায় আমরণ অনশন শুরু করেন। তিনি দুটি চিঠি লেখেন বর্তমান প্রধানমন্ত্রীকে। চিঠিতে তার দাবিগুলি ছিল নির্দিষ্ট :

১। সংসদে গঙ্গা আইন পাশ করতে হবে এবং গঙ্গা সংরক্ষণের দায়িত্ব বেসরকারি সংস্থাকে দিতে হবে।

২। গঙ্গা ও তার উপনদীর উপর নির্মিত সকল বাঁধ এবং ভবিষ্যতের সকল বাঁধ তৈরির সমস্ত প্রকল্প বাতিল করতে হবে।

৩। নদী উপকূলবর্তী সকল বৃক্ষছেদন এবং খনি ও খাদান বন্ধ করতে হবে।

৪। গঙ্গা ভক্তি পর্ষদের গঠন করতে হবে এবং যতক্ষণ না গঙ্গা-আইন সংসদে পাশ হচ্ছে, ততদিন গঙ্গার পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব এই পরিষদের দায়িত্বে রাখতে হবে।

অনশনের ১১১তম দিনে চিকিৎসার নামে তাকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুলে নিয়ে গিয়ে সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হল এবং পরদিন, অনশনের ১১২তম দিনে রহস্যজনকভাবে তাকে মৃত ঘোষণা করা হল।

এই পৃথিবীতে তার অন্তিম প্রহরগুলি কেটেছিল রাগে, দুঃখে, হতাশায়। বিজ্ঞানী, ত্যাগী সন্ন্যাসী স্বামী জ্ঞানস্বরূপ সানন্দের জীবনাবসান হল এক হৃদয়বিদারক পরিস্থিতিতে।

গঙ্গানদীর যে আন্দোলন শুধুমাত্র উত্তরাখণ্ডে সীমাবদ্ধ ছিল, স্বামী জ্ঞানস্বরূপ সানন্দের নির্মম মৃত্যু ভেঙে দিল সকল সীমারেখা। ছড়িয়ে পড়ল ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে আন্দোলিত হল বাংলার নদী ও পরিবেশ কর্মীরা। তারা পৌঁছলেন হরিদ্বার মাতৃসদনে। মাতৃসদন আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শিবানন্দজী বললেন 'স্বামী জ্ঞানস্বরূপের বলিদানের কথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে অচিরে।'

এরপর স্বামী সানন্দজীর আন্দোলন বহনের দায়িত্ব নিয়েছেন সন্ত গোপালদাসজী। তাকেও অনশনের ১৬৬তম দিনে চিকিৎসার নামে জোড় করে নিয়ে যাওয়া হল সরকারি হাসপাতালে এবং সেখান থেকে তাকে আশ্চর্য্যজনকভাবে নিখোঁজ ঘোষণা করা হল। কিছুদিন আগে তিনি ফিরে এসেছেন।

এবার আন্দোলনের প্রদীপ হাতে তুলে নিলেন ২৬ বছর বয়সী কম্পিউটার সায়েন্সের ছাত্র দক্ষিণ ভারতীয় কেরালার যুবক ব্রহ্মচারী আত্মবোধানন্দজী। আগের বলিদানরত সকলেই ছিলেন উত্তর ভারতের। ব্রহ্মচারী বললেন, 'গঙ্গা শুধুমাত্র উত্তর ভারতের নয়, দক্ষিণেরও।' আত্মবলিদান রত অল্পবয়সী যুবার প্রতিজ্ঞায় বিচলিত শুভান্যুধায়ীদের তিনি বললেন, 'আমর নয়, গঙ্গার চিন্তা করুন।' তিনি হয়তো বলতে চাইলেন এ নদী মাতৃক দেশের নদী নির্ভর সকল জীববৈচিত্র এবং জনজীবনের কথা। পরিবেশ এবং নদী কর্মীগণ মাতৃসদনের আন্দোলনকে সারা দেশ তথা বিশ্বের দরবারে ছড়িয়ে দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। আওয়াজ উঠল— 'গঙ্গা কো অবিরল বহনে দো।'

শুরু হল দিল্লির যন্তর-মন্তরে লাগাতার প্রতীকি অনশন। ছড়িয়ে পড়ল দেশের নানা প্রান্তে। বাংলায় যোগদান করলেন সকল বয়সের পরিবেশপ্রেমী। গঙ্গানদীর মোহনার সুন্দরবনের মানুষ, ছোট বড়ো মহিলা পুরুষ নির্বিশেষে সতেরজন ছুটে গেল হরিদ্বারে। মিছিল ও পোস্টারে আন্দোলনকে গতি দিতে। যুক্ত হোল গঙ্গা নদীর উৎস এবং মোহনা। প্রতিবাদ পদযাত্রা হোল দেশের রাজধানী দিল্লী থেকে হরিদ্বার মাতৃসদন। তাতে যোগ দিলেন বাংলার অতি পরিচিত কয়েকজন পরিবেশকর্মী। যুক্ত হল বাংলার প্রধান সংবাদমাধ্যম। যাত্রাপথে যোগদান করলেন সকল ধর্ম ও জাতির মানুষ। নদীর তরঙ্গের সাথে ভেসে এল গঙ্গার কথা, 'কোই ওজু করে মেরে জল সে, কোই মুরত কো নহলায়ে, কহি মোচি চামরা ধোয়ে তো কহি পণ্ডিত প্যায়াস বুঝায়।'

একে একে সন্ন্যাসীগণ আত্মবলিদান করছেন। তাঁদের আন্দোলন থেমে থাকেনি। থাকবেও না। আত্মবোধানন্দজীর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন স্বামী পূর্ণানন্দজী। যাতে নদীর অবিরলতার যে ধারায় স্বামী জ্ঞানস্বরূপ সানন্দের পর আমরা যুক্ত হয়েছি সেই ধারার অবিরলতায় আমরাও যেন থাকি অবিচলিত অবিরল।

M. 8017402774, email : tapas_08@yahoo.co.in

বি. দ্র. : শেষ খবর—National Mission for Clean Ganga-এর প্রশাসনিক প্রধান ৪ মে, ২০১৯-এর একটি চিঠিতে মাতৃসদনের শিবানন্দজীকে বলেন যে তাঁরা বেআইনি খাদান খননের প্রেক্ষিতে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও অন্যান্য নদী সংক্রান্ত দফতরের একটি দল ঘটনাস্থল প্রদর্শন করবেন। এই প্রেক্ষিতে তাঁরা অনশন বন্ধের অনুরোধ করেছেন।

ঐ চিঠির প্রেক্ষিতে আত্মবোধানন্দজী সাময়িকভাবে অনশনে বিরতি দিয়েছেন।

গঙ্গা দূষণ : বেনারসের অবস্থা

নদী কেন্দ্রিক দেশ ভারত। পানীয় জলের জন্য, কৃষির জন্য জলের প্রয়োজনে নদীর পাশে যৌথ বসবাস। পরে গ্রাম থেকে শহরের পত্তন। সেখান থেকেই শহরের সকল বর্জ্য নদীতে নিক্ষেপ। একদিকে জলে দূষণ অন্যদিকে কৃষি ও শিল্পের প্রয়োজনে নদী জলের ব্যাপক ব্যবহার। অন্যগুলির মতই গঙ্গা নদীও এই দূষণ থেকে মুক্ত নয়। পরিত্রানের আশায় ১৯৮৬তে রাজীব গান্ধী সরকার প্রথম Ganga Action Plan প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৯৩-এ দ্বিতীয় পর্যায়ে এই কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। ২০০৯তে UPA সরকার National Ganga River Basin Authority (NGRBA)-র তত্ত্বাবধানে আবার কর্মসূচি চালু করেন। কোটি কোটি টাকা খরচের পরও অবস্থার উল্লেখযোগ্য কোন পরিবর্তন হয় না। ২০১৪ সালে নতুন সরকার প্রকল্পের নাম দিলেন 'নমামি গঙ্গে'। ২০,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হল।

কিন্তু কি দেখে বুঝবো গঙ্গা কতটা দূষিত। এর জন্য দূষণ সম্পর্কিত কয়েকটি বিষয় জানা প্রয়োজন। যেমন—**কলিফর্ম ব্যাকটিরিয়া** : এটি অবায়ুজিবী, দন্ডাকার, গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটিরিয়া। উষ্ণ রক্তের প্রাণীদের ক্ষুদ্রান্তে এদের উৎপত্তি। জলে এদের উপস্থিতি প্রমাণ করে মল সংক্রমণ। বিশেষ করে ই. কোলির উপস্থিতি অন্য রোগ জীবাণুর উপস্থিতি নির্দেশ করে। ফলে জলে এর বৃদ্ধি জল পরিশুদ্ধ করণের (Water treatment) বিফলতা দেখিয়ে দেয়।

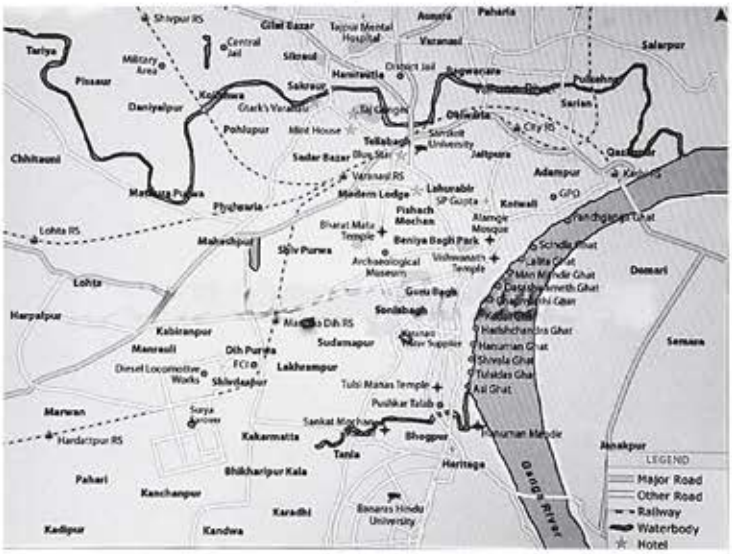

জৈব রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা, Biochemical Oxygen Demand (BOD) : বেশিরভাগ প্রাকৃতিক জলে খুব কম পরিমাণ জৈব যৌগ থাকে। জলীয় অনুজীবগুলি এই জৈব যৌগকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। এরা তাদের বৃদ্ধি ও জনন কাজের জন্য জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের সাহায্যে জৈব যৌগ ভেঙ্গে প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপন্ন করে। সুতরাং জলে মল ও কারখানার বর্জ্যে মিশে থাকা জৈব যৌগের পরিমান বৃদ্ধি অনুজীবগুলির পরিমান বাড়িয়ে দেয়। সাথে সাথে বিপাকের কারণে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমান কমিয়ে দেয়। ফলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের অভাবে জলের জীবেদের সংখ্যা কমতে থাকে। এক কথায় BOD হল জলে জৈব যৌগগুলির বিপাকের জন্য অনুজীবগুলির প্রয়োজনীয় দ্রবীভূত অক্সিজেনের চাহিদা।

দূষণের কারণ	সুরক্ষিত পরিমাণ	গঙ্গা ও অসি নদীর সংযোগস্থল	তুলসী ঘাটের সংযোগস্থল	রাজেন্দ্র প্রসাদ ঘাটের সংযোগস্থল	গঙ্গা ও বরুণার সংযোগস্থল
কলিফর্মস্ ব্যাকটেরিয়া	৫০০/১০০ মিমি জল	৩২০০০০০০০ /১০০ মিমি জল	৯০০০০ /১০০ মিমি জল	৪০০০০ /১০০ মিমি জল	৬৮০০০০০০০ /১০০ মিমি জল
BOD	৩ মিগ্রা/লি.	—	৯.৪ মিগ্রা	—	৬৮-৭০মিগ্রা
দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ	৫ মিগ্রা/লি	কম	—	—	কম

এখন গঙ্গার দূষণের পরিমাপ করতে বেনারস সংলগ্ন গঙ্গাকে বেছে নেওয়া যাক। একেবারে উত্তরে বরুনা নদী ও দক্ষিণে অসি নদীর জল গঙ্গায় এসে মিশেছে। শহরের ব্যবহৃত সমস্ত বর্জ্য আবর্জনা দুটি নদীর মাধ্যমে গঙ্গায় এসে পড়ছে। এখানে দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে একটি সংস্থা Sankat Mochan Foundation-এর হয়ে বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রনিক অধ্যাপক বিশ্বম্ভর নাথ মিশ্র গঙ্গা দূষণের পরিমাপ করছেন। দেখে নেওয়া যাক তারা কি পেলেন।

দূষণ পরিমাপের ছক থেকে সহজেই বেনারস সংলগ্ন গঙ্গায় দূষণের ভয়াবহতা আন্দাজ করা যাচ্ছে। প্রকৃত অর্থে এই দূষিত পরিবেশে ঐ অংশের জীববৈচিত্র সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস হবে।

প্রশ্ন হল কেন গঙ্গার পুরো কর্মসূচী বিফল হল। বিশ্বম্ভরজীর কথায় সর্বমোট ৩৩টা দূষণ বিন্দু থেকে নোংরা বর্জ্য গঙ্গায় ফেলা হচ্ছে। বর্জ্যের মোট পরিমাণ প্রায় ৩৫০ MLD (১০ লক্ষ লিটার) প্রতি দিনের হিসাবে। প্রথম দশার Ganga Action Plan -এর বর্জ্য পরিশোধনের ক্ষমতা ছিল ১০২ MLD। নমামি গঙ্গা প্রকল্পে এর ১৪০ ও ১২০ MLD ক্ষমতাসম্পন্ন যথাক্রমে দিনাপুর ও গয়থাহা STP (Sewage Treatment Plant) স্থাপন করা হয়। দিনাপুর থেকে আবার ৬০ এম এল ডি অপরিশোধিত অবস্থায় ছেড়ে দেওয়া হয় বরুণা নদীতে। গয়থাহাতে মোটামুটি ২০ MLD পরিশোধিত হয়। সুতরাং এখানে পরিশোধনের মাত্রা পর্যাপ্ত নয়।

অন্যদিকে প্রথম দশায় ঐ প্রকল্পের কারিগরী অংশ নির্ভর করত Activated sludge Plant (ASP)-র উপর। এটি মলের কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়া তাড়াতে পারে না। অথচ এটিই সকল জলবাহক রেগের উৎস। বর্তমানের Sequential Batch Reactor (SBR)-র কারিগরী আগেরটার মতই।

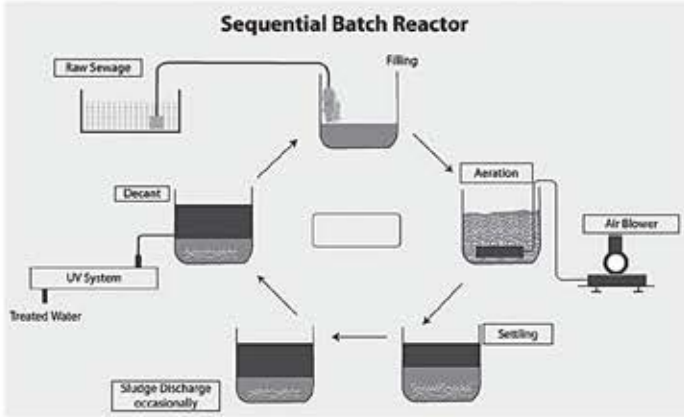

সুতরাং দেখাই যাচ্ছে বর্তমানে হতাশা ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না। বরং এত কান্ড করার পরও বর্তমানে গঙ্গার দূষণ অতিতের চেয়েও খারাপ হয়েছে।

নতুন গবেষণার অলিন্দে

অমিতাভ চক্রবর্তী

এক প্রাগৈতিহাসিক নদীর সন্ধান

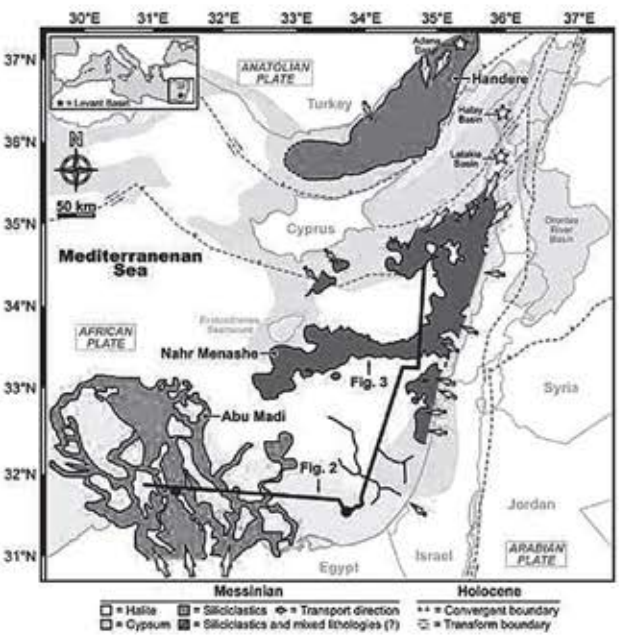

এক সময়ে নীলনদের মতো বড়ো একটি নদী প্রবাহিত হতো আজকের তুরস্ক ও সিরিয়ার উপর দিয়ে। সম্প্রতি জানা গেছে হারিয়ে যাওয়া এই নদীটির কথা, যা প্রায় এক লক্ষ বছর ধরে প্রবাহমান ছিল পৃথিবীর বুকে। ৫৩ থেকে ৬০ লক্ষ বছর আগের কথা, তখন মায়োসিন যুগের শেষ পর্যায়। সে এক আশ্চর্য সময়, যাকে অবহিত করা হয় মেসিনিয়ান স্যালিনিটি ক্রাইসিস (Messinian salinity crisis) বা MSC হিসাবে। এই সময়ে ভূমধ্যসাগর ও অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চল থেকে বিপুল পরিমাণ জলরাশি বাষ্পীভূত হয়ে যায়। জেগে ওঠে এক রুক্ষ ও পাথুরে এলাকা। আলাদা হয়ে যায় ভূমধ্যসাগর ও অ্যাটলান্টিক মহাসাগর। প্রায় ছয় লক্ষ বছর ধরে শুষ্ক থাকার পর টেকটোনিক প্লেটের পুনর্বিন্যাসের ফলে তৈরি হয় এক সরু প্রণালী। স্পেন ও মরক্কোর মাঝে জিব্রালটার প্রণালী হিসাবে যা আজও জেগে আছে। সম্প্রতি Geology জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে এক গবেষণা প্রবন্ধ। গবেষকদের মতে বিশাল এই সমুদ্র বক্ষের বিপুল পরিমাণ জলরাশি MSC-তে শুকিয়ে গেলেও প্রায় ২০-২৫% জল নিয়ে সেখানে থেকে গিয়েছিল একটি লেক, যেখান থেকে বজায় ছিল এই নদীর জলপ্রবাহ। সিরিয়া, লেবানন, সাইপ্রাস, ইজরায়েল প্রভৃতি দেশের সংলগ্ন সাগর অঞ্চলের বিপুল পরিমাণ সিসমিক তথ্য পর্যালোচনা করে এই হারিয়ে যাওয়া নদীর ম্যাপ তৈরি করেছেন গবেষকরা। আসলে বর্তমানে এই অঞ্চলে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ নদীতন্ত্র দেখতে পাওয়া যায় না। তাই বিজ্ঞানীদের আশা এই নতুন গবেষণা হয়তো ভূপৃষ্ঠের অভ্যন্তরে ঘটে চলা টেকটোনিক প্লেটের মুভমেন্ট ও তার সঙ্গে সম্পর্কিত জলবায়ুর পরিবর্তনকে বুঝতে আমাদের নতুন দিশার সন্ধান দেবে।

গার্গী নাগ মজুমদার

পরিবেশ বিপর্যয় ও সভ্যতার পরিণতি

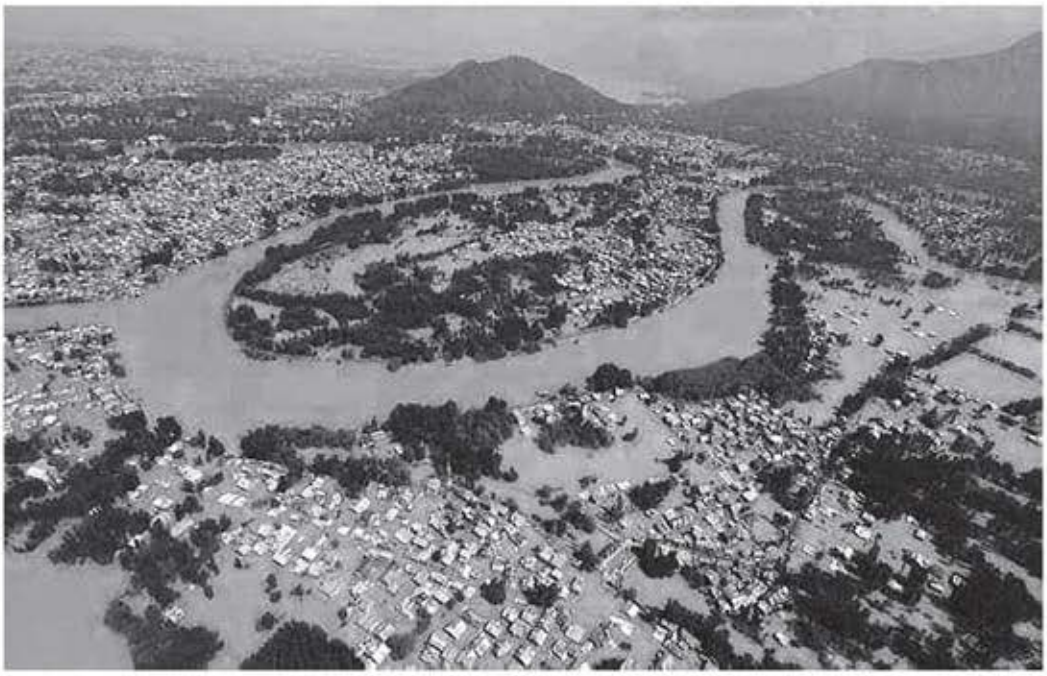

কেরালার সাম্প্রতিক বন্যা বিপর্যয়

ছোটবেলায় আমরা অনেকেই একটা গল্প শুনেছিলাম। একবার এক রাজার ইচ্ছে হল তিনি দুধপুকুর প্রতিষ্ঠা করবেন। তাঁর নির্দেশে পুকুর খনন হল। তারপর রাজা হুকুম দিলেন প্রত্যেক প্রজাকে এক ঘটি করে দুধ এনে ঐ পুকুরে ঢালতে হবে। তবেই পুকুর দুধে পূর্ণ হবে। সার্থক দুধপুকুর তৈরি হবে। প্রজারা মাথা নীচু করে হুকুম শুনল, ঘাড় নেড়ে নীরব সম্মতিও জনাল। সন্তুষ্টচিত্তে রাজা রাত্রে নিদ্রা গেলেন। ভোর হতে না হতেই রাজার আর তর সয়না। দুধে পূর্ণ পুকুর দেখতে তিনি ছুটে এলেন। কিন্তু এ কি? পুকুরে দুধ কই? পুকুর তো যে কে সেই টলটলে জলেই পূর্ণ। রাজা ক্রোধান্বিত হলেন। কিন্তু উপায় কি? শাস্তি দেবেন তো দেবেন, কাকে দেবেন শাস্তি? আসলে প্রত্যেক প্রজাই ভেবে নিয়েছিল যে অন্যরা সবাই তো ঘটিতে দুধ ভরে এনে পুকুরে ঢালবে, তার মধ্যে আমি যদি এক ঘটি দুধের বদলে এক ঘটি জলই ঢালি ক্ষতি কি? কে আর দেখতে যাচ্ছে?

আমরাও সবাই ঠিক একই রকমভাবে ভেবেছি। কয়েকমাস আগের কেরলের ভয়াবহ বন্যা প্রকৃতির নির্মম উপহাস হলেও একথা না মেনে নিয়ে আজ আর কোনও উপায় নেই যে, প্রকৃতি এই প্রতিশোধের মধ্য দিয়ে আরও একবার চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের ভুলগুলোকে যেন চিনিয়ে দিয়ে গেল। আজ মিডিয়ার সংবাদ-সম্প্রচারের সামনে বসে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে খবর শুনে কিংবা সংবাদপত্রে কেবল বন্যার খবর পড়ে ক্ষয়ক্ষতির বহর শুনে যতই আমরা শিউড়ে উঠি না কেন কি করে অস্বীকার করব যে এই বিপর্যয় কিন্তু প্রথমবার নয়। এর মাত্র কয়েকবছর আগেই আমরা প্রত্যক্ষ করেছিলাম উত্তরাখণ্ডের ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে (২০১৩)। সেবারও আমরা প্রায় সকলেই বন্যাদুর্গতদের প্রতি একাত্মতা অনুভব করেছি, যে যার মতো যথাসাধ্য

ত্রাণের কাজে অংশ নিয়েছি, কাছে থেকে, শত যোজন দূরে থেকেও। কিন্তু তার চেয়েও বড়ো কথা এই যে আমরা সবাই তখন একবাক্যে মেনে নিয়েছিলাম যে— এ আমাদের সম্মিলিত ভুলের চরম মাসুল। অনেকগুলি প্রাণ বলি দিয়ে মূল্য চোকাতে হয়েছিল তখন। প্রকৃতি কিন্তু তখনই আমাদের সতর্ক করেছিল। সময় সারণির পথ বেয়ে আরও কিছুটা পিছিয়ে গেলে আমাদের মনে পড়বে দক্ষিণ-ভারতের সমুদ্রতটে আছড়ে পড়া সমুদ্রঝড় আয়লার তাণ্ডবের কথা আজও যার বিধ্বংসী চিহ্ন সম্পূর্ণ মুছে যায়নি।

পরিবেশবিদরা হায় হায় করে উঠেছিলেন। আমরাও সবাই ঠেকে শিখেছিলাম। পরিবেশকে বাঁচানোর লড়াইটা মানব সভ্যতার সামনে একটা মস্ত বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখেছিলাম। এ লড়াই আমাদের বাঁচার লড়াই। এ লড়াই আমাদের অস্তিত্বের লড়াই।

হরপ্পা : শিল্পী ক্রীস স্যাটায়ান

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যার চাপ, জনবসতির ঘনত্ব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাবে স্বাভাবিকভাবেই— এ জানা কথা। কিন্তু তার মধ্যেও প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার দায় আমাদের সবার সম্মিলিত দায়। আমরা কেউই সেই দায় এড়াতে পারি না। মজার কথা এই যে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হলে কি যে হবে, বাস্তুতন্ত্রের ভরকেন্দ্র যদি নড়ে যায়— তবে কি মর্মান্তিক হতে পারে তার ফল— আমরা অনেকেই কম বেশি জানি এবং বুঝি। তবু আমরা সবাই যেন কালিদাস। যে ডালে বসে আছি সেই ডালেই কোপ বসিয়ে চলেছি। নির্বিচারে গাছ কাটা, যত্রতত্র ট্যুরিজমের নামে জলা বুজিয়ে বেআইনি নির্মাণ, প্লাস্টিক দূষণ, শব্দদূষণ, বায়ুদূষণ হচ্ছে হোক। বেকার মাথা ঘামিয়ে লাভ কি বাবা। তার থেকে অনেক ভালো নিরূপদ্রব জীবন। প্রতিবাদের ঝামেলা অনেক। আর সঙ্গে রাজনীতির কচকচানি জুড়ে গেলে তো কথাই নেই। গুন্ডাগিরি, মস্তানি, প্রাণভয়, কেঁচো খুঁড়তে সাপের ভয়— সে হাজার ঝক্কি। তার চেয়ে যা ইচ্ছে হোক। আমি আর আপনি তো অন্ততঃ নিরাপদে আছি। তা হলেই হল।

কিন্তু এমনটা হলে তো মিটেই যেত। কিন্তু কেরলের বন্যা সেটা আর হতে দিল কই? এখন আমাদের সবার মনেই ভয় ঢুকেছে। আজ অনেক দেরীতে এসে আমরা বুঝতে পারছি—এ আমাদের সবার সম্মিলিত লোভ ও অপরিণামদর্শীতার ফল। প্রকৃতি শোধ না তুলে ছাড়বে না।

আসলে আমরা অনেকটা এগিয়েছি, কিন্তু ভুলে গিয়েছি আমাদের অতীতটাকে। আজ নাসা সূর্যে সৌরযান পাঠিয়েছে, চাঁদে নতুন করে অভিযান চালিয়ে বরফের অস্তিত্ব সম্পর্কে নতুন করে নিঃসন্দেহ হয়েছে। এগুলো আমাদের মানবসভ্যতার অমূল্য সম্পদ, অমূল্য কৃতিত্ব। কিন্তু একেতো শুধু অর্জন করলেই হবে না, টিঁকিয়েও তো রাখতে হবে। আর সেটাও আমাদের সবার দায়িত্ব। সবাই একসঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সেই দায়িত্ব পালন করলে তবেই সভ্যতা টিঁকবে। নতুবা কে জানে হয়তো-বা একদিন তার পরিণতি হবে ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পাওয়া মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার মতোই।

আনুমানিক ৩০০০-২৫০০ খ্রিস্টপূর্ব প্রাচীন পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীনতম সভ্যতা অবিভক্ত ভারতের সিন্ধু সভ্যতা (আবিষ্কারকাল ১৯২০-১৯২২ খ্রিস্টাব্দ)।পৃথিবীর প্রাচীনতম সভ্যতাগুলি যেমন মিশরীয়, মেসোপটেমিয়, চৈনিক সভ্যতার সমসাময়িক হলেও নগর পরিকল্পনা, শহরের জলনিকাশী ব্যবস্থা, বহির্বাণিজ্যের দক্ষতায় এই সিন্ধুসভ্যতাই অন্য সভ্যতাগুলির মধ্যে ঈর্ষণীয় স্থানাধিকারী। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ভারততত্ত্ববিদ এ. এল. ব্যাসাম তাঁর The Wonder that was India শীর্ষক বিখ্যাত গ্রন্থে এর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে লিখেছেন যে সিন্ধুসভ্যতার পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা এতটাই উন্নত ছিল যে তা শুধুমাত্র প্রাচীন রোমান সভ্যতার পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থার সঙ্গেই তুলনীয় ছিল।

মহেঞ্জোদারোর পয়ঃপ্রণালী

সেই সিন্ধুসভ্যতারই দুটি ঝকঝকে প্রাণবন্ত শহর ছিল হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো। কৃষি, বাণিজ্য, কারিগরি দক্ষতায় ভরন্ত এক মজবুত

অর্থনীতির ওপর ভিত্তি গাঁথা ছিল যার। কিন্তু কালের উপহাস না কি প্রকৃতির প্রতিশোধ— কি বলব তাকে? এমন প্রাণবন্ত শহর দুটি আনুমানিক ১৯০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ নাগাদ তছনছ হয়ে হারিয়ে গেল, কালের গর্ভে বিলুপ্ত হয়ে গেল চিরতরে।

অনেক বিতর্ক রয়েছে এ নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে। তবে বিতর্কের মূল সুরটি এই যে, প্রাকৃতিক বিরূপতা ও বিপর্যয় এই সিন্ধুসভ্যতাকে চিরতরে ধ্বংস করে দিয়েছে। পর পর একাধিক বার বন্যায় ভেসে গিয়েছিল শহর দুটি। বিপর্যয় মোকাবিলা করতে না করতেই দিন দিন কমেছে বৃষ্টিপাত। পার্শ্ববর্তী রাজস্থানের থর মরু অঞ্চল এগিয়ে এসে গ্রাস করে নিয়েছে এই এলাকাকে। উপর্যুপরি ভূমিকম্পে কেঁপে গিয়েছিল শহর দুটির ভিত। বৈদেশিক আক্রমণকারীরা এরই সুযোগ নিয়েছিল।

মর্টিমার হুইলার এবং এছাড়া অন্যান্য অধিকাংশ গবেষকরাই মনে করেন যে পরবর্তীকালে সিন্ধু অধিবাসীদের মধ্যে পূর্বের অভ্যস্ত আঁটোসাঁটো পৌরজীবন ও সেই সম্পর্কিত শৃঙ্খলাবোধ লুপ্ত হয়ে নৈতিক শৈথিল্য দেখা দিয়েছিল। জনসংখ্যা ও জনবসতি ক্রমশঃ বাড়ছিল। মানুষজন নির্বিচারে ব্যাপকহারে বৃক্ষ নিধন করছিল। বাড়ি বানানোর প্রয়োজনে অল্পসময়ের মধ্যে নির্বিচারে ইট পোড়ানো হচ্ছিল। ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকার পরিবেশগত ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হচ্ছিল অতিদ্রুত হারে। কমছিল বাষ্পমোচন ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, ভূমিক্ষয় হচ্ছিল। মাটি ক্রমশঃ শুষ্ক, ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ছিল। পার্শ্ববর্তী মরু অঞ্চল এগিয়ে এসে গ্রাস করে নিচ্ছিল লোক বসতিকে। তাছাড়া— সিন্ধুনদে নির্বিচারে আবর্জনা নিক্ষেপ করায় নদীতল অগভীর হয়ে পড়ছিল। ফলে প্লাবণ দেখা দিতে লাগল ঘন ঘন। সব মিলিয়ে রুষ্ট প্রকৃতি যখন মুখ ফিরিয়ে নিল তখন এক সময় এই সভ্যতাও চিরতরে তলিয়ে গেল অতীতের গর্ভে। আজ হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়ো শুধুই ইতিহাস।

অতঃকিম্? আমরা তাহলে কোন পথে হাঁটব? কোন ভবিষ্যতকে বেছে নেব? কেরলের বন্যা যতই বিধ্বংসী হোক না কেন, এই বিপর্যয়কে হয়তো আমরা ধীরে ধীরে একদিন কাটিয়ে উঠবো। কিন্তু ভবিষ্যতে আরও কোনও বৃহত্তর বিপর্যয় যেন ঘনিয়ে এসে আমাদের সভ্যতাকে গ্রাস না করে ফেলে সেই অঙ্গীকার যদি আমরা আজও না করি তাহলে কাল হয়তো অনেক বেশি দেরি হয়ে যাবে।

email : gargi.nag.majumdar@gmail.com

নন্দগোপাল পাত্র

বিজ্ঞান, অপবিজ্ঞান ও বিজ্ঞানমনস্কতা

বিজ্ঞানশিক্ষাই এই বইয়ের অন্যান্য সকল প্রাণীর থেকে মানুষকে আলাদা করেছে। অরণ্যচারী জীবন থেকেই মানুষ বিজ্ঞানচর্চা করে আসছে। ফলে নিজেদেরকে প্রাণীজগতের সর্বোচ্চ স্তরে নিয়ে যেতে পেরেছে। তাই মানুষের প্রধান পরিচয় যুক্তিবাদী হিসেবে। তবে সবক্ষেত্রেই মানুষ যে যুক্তিবাদী তা কিন্তু নয়। একদল মানুষ যখন নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই মনুষ্য সমাজের কিছু অংশ অবিজ্ঞান, ভ্রান্তবিজ্ঞান ও কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে বহু তথাকথিত শিক্ষিত মানুষও। যা দেখা গেল সেপ্টেম্বর ২০১৮য় আমাদের দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী হর্ষবর্ধন কলকাতার আইএসিএস-এর দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের শিলান্যাসের দিন 'গণেশ চতুর্থী'র মতো 'শুভ দিন'-এ হওয়ায় সন্তোষ প্রকাশ করায়। তাঁর মতো বিজ্ঞানে শিক্ষিত মানুষের মধ্যে এমন গোঁড়ামি ও সংকীর্ণতা! শ্রী হর্ষবর্ধন ভারতীয় সংবিধান ছুঁয়ে শপথ নিয়েছেন। যার মৌলিক কর্তব্যের ৫১-এ ধারার এইচ উপধারায় রয়েছে It shall be the duty of every citizens of India to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform। অবশ্য এ ধরনের বক্তব্য এর আগেও শোনা গেছে তাঁর থেকে। ১০৫তম জাতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসেও বলেছিলেন 'আইনস্টাইনের চেয়ে বেদ এগিয়ে'। তাই বলে এই গোঁড়ামি আই.এসি.এস-এর বর্তমান অধিকর্তার মানসিকতায়ও। আসলে কেউ বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত হলেই যে বিজ্ঞানমনস্ক হবেন এরকম ভাবা যাবে না। বিজ্ঞানমনস্কতার গোড়ার কথাই হল বুঝতে শেখা, প্রশ্ন করতে শেখা এবং যে কোনও অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতন হওয়া। এই চেতনা আমাদের ব্যক্তিজীবনে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে যখন সারাজীবন বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করেও আমরা ঠিকভাবে যুক্তিবাদী বা বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে উঠতে না পারি।

বিজ্ঞান চেতনা যে শুধু কিছু তত্ত্ব, ছবি আর চিহ্নমাত্র নয়, আসলে একটা সংস্কৃতি— যা জীবনের সর্বত্রই বজায় রেখে চলতে হয়, যা কোনও অযৌক্তিক ধারণাকে প্রশ্রয় দেওয়ার বিরোধী। দুর্ভাগ্য আমাদের স্বাধীনতার ৭১ বছর পরেও আমরা কুসংস্কার বিরোধিতাকে আমাদের সংস্কৃতি করে গড়ে তুলতে পারিনি। নারকেল ভেঙে, গণেশ পুজো করে বিজ্ঞান কেন্দ্রের শিলান্যাস তা-ই ভাবাতে বাধ্য করছে। দেখা গেছে

মননে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবোধ প্রাধান্য পেলে অন্ধ বিশ্বাসের মূল অনেকটাই আলগা হয়ে যায় বটে— কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই কিছুটা ভগ্নাংশ রয়ে যায় মনের আনাচে কানাচে। এর কারণ হল বৈজ্ঞানিক যুক্তিবোধ ধারণ করার জন্য যতটুকু নির্মোহ এবং যুক্তিনিষ্ঠ হওয়ার শক্তি দরকার— ততটা মানসিক শক্তি আমাদের সবার থাকে না। এই প্রয়োজনীয় মানসিক শক্তি অর্জনের একটি প্রধান উপায় হল— বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদের চর্চা, মুক্তমনা হবার মানসিক সংগ্রাম। এ সংগ্রাম শুরু করাটা কঠিন, চালিয়ে যাওয়া কঠিনতর। যাঁরা বিজ্ঞানমনস্কতার মানে বোঝেন, যাঁরা সত্যিই সমাজকে যুক্তিবাদী হয়ে উঠতে সাহায্য করেন, আমাদের দেশে তাঁদের ভবিষৎ ভালো নয়। ২০ আগস্ট ২০১৩ নরেন্দ্র দাভলকর, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৫ গোবিন্দ পানসারে, ৫ সেপ্টেম্বর ২০১৭ গৌরী লঙ্কেশ সামাজিক আবর্জনা দূরীকরণের মহান লক্ষ্যে শহিদ হলেন।

অন্যদিকে পাঠক্রমের পাশাপাশি বিজ্ঞান মানসিকতার বিকাশ বা বৈজ্ঞানিক মেজাজ গঠন করার চেষ্টা এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তিকে জনকল্যাণের, জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের কাজে প্রয়োগ করা, বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণ প্রয়াস, লেখায় বক্তৃতায় বিজ্ঞানের তথ্য ও তত্ত্ব প্রচার করার কাজে ভারতে বিজ্ঞান আন্দোলনের সূত্রপাত। সাম্প্রতিক সময়ে বিজ্ঞান আন্দোলনের ধারা অনেকটাই বদলেছে। কাজের ব্যাপ্তি বাড়ার ফলে বহু মানুষ এই আন্দোলনে যুক্ত হয়েছে। তবে বর্তমানে সময়ের অনিবার্য রাজনীতির রং লেগেছে। রাজনীতির সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্পর্ক কোনও কালেই মধুর ছিল না। জিয়োর্দানো ব্রুনো (১৫৪৮-১৭.২.১৬০০), এবং গ্যালিলিও গ্যালিলি (৫.২.১৫৬৪-৮.১.১৬৪২)-এর মৃত্যুদণ্ড কিংবা হেনস্থা ওই সম্পর্কে নিদর্শন। তেমনই বিজ্ঞান চেতনার সঙ্গে ধর্মবোধের সংঘাত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে চিরকালই ছিল। সকল ধর্মের মূল দর্শন অত্যন্ত উদার, যা মানুষকে হিংসা, লোভ ত্যাগ করতে শেখায়, অন্যকে ভালো রাখতে শেখায়। দুঃখের বিষয় ধর্মের ব্যবহারিক দিকটি যাঁদের তত্ত্বাবধানে থাকে সেই মোল্লা, পুরুত, পাদ্রীদের হাতে পড়ে ধর্ম কোনও কোনও ক্ষেত্রে উৎপীড়কের ভূমিকা নেয়। যুগে যুগে ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় তাই কলঙ্কিত হয়েছে যাজকতন্ত্রের হাতে বিজ্ঞানীদের লাঞ্ছনার কাহিনীতে। বিজ্ঞানমনস্কতা প্রসারের কাজটা দীর্ঘমেয়াদী। চট জলদি শর্টকার্ট কোনও পদ্ধতি নেই। আর কিছুদিনের মধ্যেই একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকটি অতিক্রান্ত হবে। অথচ আমাদের ভারতের বিরাট অংশের জনগণ আজও অন্ধবিশ্বাস আর কুসংস্কারের চোরাবালিতে নিমজ্জিত। কে না জানে, উন্নয়নের যে কোনও রকমের কর্মকাণ্ড মানব সম্পদের প্রকৃত ও পর্যাপ্ত ব্যবহার ব্যতীত থমকে যেতে বাধ্য! বিজ্ঞানমনস্কতার অভাবে একটি দেশ কেবল চেতনাতেই দরিদ্র থাকে না, সম্পদেও দরিদ্রই থেকে যায়।

বিজ্ঞানমনস্কতার অভাব দেশের গণতান্ত্রিক পরিবেশের পক্ষেও ভালো নয়। বিজ্ঞানমনস্কতার প্রসার মানে যুক্তিবাদের প্রসার। একটি গণতান্ত্রিক দেশ যদি প্রকৃত উন্নয়নের লক্ষ্যে এগুতে চায়, সেই দেশের জনগণকে সবার আগে বিজ্ঞানমনস্ক করে গড়ে তুলতে হয়। সেই কাজের দায় যতখানি ব্যক্তি আর সংগঠনের, ততখানি রাষ্ট্রের।

M. 9434341156, 9647313642

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান

অ নি ন্দ্য দে

ধোঁয়াটে কাচ

বাথরুমে গরম জলে স্নান করার পর আয়নাটা কেমন কুয়াশার মতো বাষ্পে ঢেকে যায় সেটা নিশ্চয়ই আপনারা লক্ষ করেছেন। বৃষ্টির দিনে গাড়ির চালকের সামনের কাচের ভেতরের দিকেও ঐরকম বাষ্প জমে। কেন এটা হয় বলতে পারেন?

আসলে পুরোটাই পৃষ্ঠটানের ব্যাপার। সাধারণত তরলের মুক্ততল অনুভূমিক থাকে। কিন্তু তরলপৃষ্ঠ যখনই কোনও কঠিনের সংস্পর্শে আসে পৃষ্ঠটানের জন্য ওই তরলতল আর অনুভূমিক থাকতে পারে না। তরল বিন্দু আর যে তলের উপর সে অবস্থান করছে, তাদের মধ্যে যে কোণ তৈরি হয় তাকে বলা হয় স্পর্শকোণ। পৃষ্ঠটানের কারণে তরলবিন্দু যত গুটিয়ে আসে, স্পর্শকোণ তত বাড়তে থাকে।

আপনার বাথরুমের আয়না বা গাড়ির কাচটাকে আপনি যতই সাফ-সুতরো ভাবুন না কেন, আসলে কিন্তু সেটা খুবই ময়লা। জলকণা সেই ময়লার উপরে গিয়েই জমে। কিন্তু ওই ময়লার জন্য জল আর আয়নার মধ্যেকার স্পর্শকোণ বেশ কিছুটা বেড়ে যায়। ফলে জলকণা বেশিদূরে ছড়িয়ে পড়তে পারে না, ছোট ছোট বিন্দুর আকারে ঘনীভূত হয়। ওই জলবিন্দুগুলো তখন চারদিকে আলো বিক্ষিপ্ত করতে শুরু করে, ফলে আয়না বা গাড়ির কাচকে ধোঁয়াটে দেখায়।

অনেক চেষ্টা করেও কিন্তু ওই ময়লা দূর করা সম্ভব হয় না। সামান্য ময়লা অবশিষ্ট থাকলেই সেটা স্পর্শকোণকে বাড়িয়ে দেয়। একটু ডিজারজেন্ট বা সাবানগোলা জল লাগিয়ে স্পর্শকোনের মান অনেকটা কমিয়ে আনা যায়। সদ্য কাটা আলুর রসের আস্তরন লাগালেও কাজ হবে।

উৎপল মুখোপাধ্যায়

সংখ্যা-পাগল এক শিক্ষক

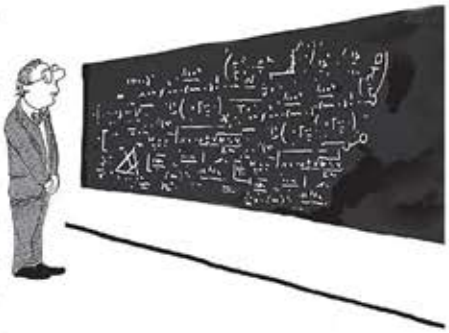

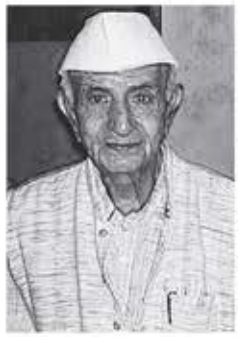

তাঁর পেশা ছিল শিক্ষকতা, নেশা ছিল অঙ্ক কষা। যেকোনো অঙ্ক নয়, সংখ্যা নিয়ে নানা কারিকুরি। সংখ্যা নিয়ে মেতে থাকতে ভালবাসতেন মানুষটি। মহারাষ্ট্রের সেই বিদ্যালয় শিক্ষকের নাম দত্তাত্রেয় রামচন্দ্র কাপ্রেকার। তাঁর জন্ম ১৯০৫ সালে বর্তমান মুম্বাই থেকে কিছুটা উত্তরে আরব সাগরের তীরের শহর দাহানু-তে। কাপ্রেকার আট বছর বয়সে মাতৃহারা হন ও তাঁর বাবা তাঁকে প্রতিপালন করেন। থানে-তে স্কুল জীবন কাটিয়ে তিনি পুনের ফার্গুসন কলেজে ভর্তি হন। ১৯২৭ সালে তিনি গণিতে Envelope-এর তত্ত্বের উপর একটা মৌলিক কাজ করার সুবাদে র‍্যাংলার আপ. পি. পরাঞ্জপে পুরস্কার পান। ১৯২৯ সালে কাপ্রেকার ওই কলেজ থেকে বি. এস. সি. পাস করেন। তার পরের বছর ১৯৩০ সাল থেকে তিনি মহারাষ্ট্রের নাসিকের একটি স্কুলে শিক্ষকতার কাজ শুরু করেন ও সেখান থেকে ১৯৬২ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

রোজদিন ক্লাসে রুটিনমাফিক পড়ানো আর তারপর একদিন অবসর নেওয়া— হাজার হাজার শিক্ষকের জীবন এইরকম আটপৌরে ভাবেই কেটে যায়। কিন্তু, কাপ্রেকার আর পাঁচজন শিক্ষকের মতো গতানুগতিকভাবে জীবন কাটাতে চাননি। তাই তিনি সংখ্যা নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করলেন। কলেজে পড়ার সময় থেকেই সংখ্যা নিয়ে নানা হিসেবনিকেশের ঝোঁক ছিল কাপ্রেকারের। উচ্চ গণিতে সংখ্যাতত্ত্ব বা নাম্বার থিয়োরি অন্যতম পাঠ্য বিষয় ও তার অনেক জটিল তত্ত্ব-ও আছে। কিন্তু কাপ্রেকারের নেশা ছিল তত্ত্বের দিকে নয়, সংখ্যা নিয়ে খেলার দিকে। একে বলা হয় রম্য গণিত বা রিক্রিয়েশনাল ম্যাথামেটিক্স। সংখ্যা নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে করতে কাপ্রেকার আশ্চর্য সব ফলাফল আবিষ্কার করতে শুরু করেন। যেমন তাঁর একটি বিখ্যাত আবিষ্কার হল 'কাপ্রেকার ধ্রুবক'। এছাড়া কাপ্রেকার সংখ্যা, হর্ষদ সংখ্যা, স্বয়ম্ভু সংখ্যা ইত্যাদিও তাঁরই অবদান। আবৃত্ত দশমিক (পৌনঃপুনিক) সংখ্যা ও ডেমলো সংখ্যার উপরেও কাপ্রেকার প্রচুর কাজ করেছেন। কোপারনিকাস ম্যাজিক স্কোয়ার, মহাত্মা গান্ধী শতাব্দী স্কোয়ার, নিউটনস ম্যাজিক স্কোয়ার, হারমনিক নাম্বার ম্যাজিক, দত্তাত্রেয় সংখ্যা, ম্যাজিক হেক্সাগন ইত্যাদি বহু জার্নাল তাঁরই চিন্তার ফসল। অঙ্কের ধাঁধাও ছিল তাঁর এক অত্যন্ত প্রিয় বিষয়। ভারতের বিজ্ঞান পত্রিকাগুলো ছাড়াও বিদেশের জার্নাল অফ রিক্রিয়েশনাল ম্যাথামেটিকস-এ কাপ্রেকারের প্রায় ৪০টির মতো প্রবন্ধ বা টীকাজাতীয় লেখা ছাপা হয়েছিল। প্রায় ৩০টি ছোট পুস্তিকা তিনি প্রকাশ করেছিলেন। ডেমলো সংখ্যার ওপর কাপ্রেকারের প্রায় ২০টি কাজের একটি সংকলন বইরূপে লিখেছেন। এছাড়া বিভিন্ন বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং গণিত সম্মেলনে তিনি প্রচুর বক্তৃতা দিয়েছেন। এতো কিছু সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীমহল তাঁর কাজগুলোকে গুরুত্ব দেননি। কিন্তু, এই অবহেলাও কাপ্রেকারকে হতাশ করতে পারেনি। তিনি নিরলসভাবে তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে গণিতচর্চা করে গেছেন। অবশেষে রম্য গণিতের বিখ্যাত লেখক মার্টিন গার্ডনার (১৯১৪-২০১০) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মর্যাদাসম্পন্ন বিজ্ঞান পত্রিকা সায়েন্টিফিক আমেরিকান-এর ১৯৭৫ সালের মার্চ সংখ্যায় কাপ্রেকারের সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখার পর কাপ্রেকার তাঁর কাজের কিছুটা স্বীকৃতি পান। ম্যাথামেটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া (দিল্লি চ্যাপ্টার), মহারাষ্ট্র গণিত মণ্ডল, অ্যাসোসিয়েশন অফ ম্যাথামেটিকস টিচারস ইন ইন্ডিয়া ইত্যাদি কয়েকটি গণিত সংস্থা কাপ্রেকারকে সম্মান জানায়। কাপ্রেকার ১৯৮৬ সালে দেওলালিতে প্রয়াত হন। তিনি 'গণিতানন্দ' নামেও পরিচিত ছিলেন।

কাপ্রেকারের সংখ্যা নিয়ে কাজের বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ এখানে নেই। শুধুমাত্র 'কাপ্রেকার ধ্রুবক' সম্পর্কে সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। কাপ্রেকার দেখান যে চারটি বিভিন্ন অঙ্ক দিয়ে তৈরি সবচেয়ে বড়ো সংখ্যা থেকে সবচেয়ে ছোট সংখ্যাটিকে বিয়োগ করলে বিয়োগফল হয় ৬১৭৪ হবে অথবা অন্য সংখ্যা হবে। যদি বিয়োগফল ৬১৭৪ না হয় তবে বিয়োগফলের অঙ্কগুলি (সেগুলি বিভিন্ন না-ও হতে পারে) দিয়ে তৈরি বৃহত্তম সংখ্যা থেকে ক্ষুদ্রতম সংখ্যাটি বিয়োগ করতে হবে। এই প্রক্রিয়া চালিয়ে গেলে একসময় বিয়োগফল হিসেবে ৬১৭৪ সংখ্যাটি অবশ্যই পাওয়ার যাবে, অর্থাৎ বিয়োগফল ৬১৭৪ হবেই। এই কারণে ৬১৭৪ সংখ্যাটি কাপ্রেকার ধ্রুবক বলা হয়। ১৯৪৯ সালে কাপ্রেকার ধ্রুবক আবিষ্কৃত হয়েছিল। একইভাবে তিন অঙ্কবিশিষ্ট সংখ্যার ক্ষেত্রে কাপ্রেকার ধ্রুবকের মান ৪৯৫। চার অঙ্কের সংখ্যার ক্ষেত্রে একটি উদাহরণ দেওয়া যাক।

ধরা যাক ৫, ২, ৩, ৯ এই চারটি অঙ্ক নেওয়া হল। এদের দিয়ে তৈরি বৃহত্তম সংখ্যা ৯৫৩২ এবং ক্ষুদ্রতম সংখ্যা ২৩৫৯।

প্রথম ধাপ : ৯৫৩২ - ২৩৫৯ = ৭১৭৩ (৬১৭৪ নয়)
দ্বিতীয় ধাপ : ৭৭৩১ - ১৩৭৭ = ৬৩৫৪ (৬১৭৪ নয়)
তৃতীয় ধাপ : ৬৫৪৩ - ৩৪৫৬ = ৩০৮৭ (৬১৭৪ নয়)
চতুর্থ ধাপ : ৮৭৩০ - ০৩৭৮ = ৮৩৫২ (৬১৭৪ নয়)
পঞ্চম ধাপ : ৮৫৩২ - ২৩৫৮ = ৬১৭৪

সুতরাং, এক্ষেত্রে পঞ্চম ধাপে গিয়ে ৬১৭৪ সংখ্যাটি পাওয়া গেল।

সবশেষে এটা বিশেষভাবে বলা প্রয়োজন যে কাপ্রেকার সংখ্যাতত্ত্ব সম্পর্কে প্রথাগত শিক্ষালাভ না করলেও গণিতের প্রতি ভালোবাসা ও অক্লান্ত প্রচেষ্টার সাহায্যে নিজস্ব পদ্ধতিতে সংখ্যাজগতের বিভিন্ন মণিমুক্তো উপহার দিয়েছেন আমাদের। এই কারণেই রামচন্দ্র দত্তাত্রেয় কাপ্রেকার চিরস্মরণীয়।

M. 9830518798, email : utpalsbv@gmail.com

ডাঃ সুচন্দা সর

চোখের বালি— দূষণ কিভাবে দৃষ্টি নষ্ট করছে

চোখ খুবই সুক্ষ এবং সংবেদনশীল মূল্যবান অঙ্গ। চোখের মণি প্রতিনিয়ত উন্মুক্ত অবস্থায় পরিবেশের সংস্পর্শে আসছে। উন্মুক্ত স্বচ্ছ মণিকে পরিবেশ থেকে রক্ষা করে মূলত চোখের জল বা tear film। পরিবেশ দূষিত হলে চোখের ওপরেও এর প্রভাব পড়ে। এর প্রধান কারণ বায়ুদূষণ বা Air pollution।

প্রাকৃতিক পরিবেশ শহরেই বেশি দূষিত হয়। কলকারখানার, গৃহ নির্মাণের এবং গাড়ির ধূলো ও ধোঁয়া পরিবেশকে কলুষিত করছে। এই কালো ধোঁয়া পরীক্ষা করে জানা গেছে যে, এতে হাইড্রোকার্বণ, নাইট্রোজেন-ডাই-অক্সাইড, সালফার-ডাই-অক্সাইড, ওজোন এবং পার্টিকুলেট ম্যাটার (PM) থাকে। তারাই চোখের বেশি ক্ষতি করে। শুধু চোখ নয়, এই দূষণের ফলে শ্বাসনালী, হার্টের অসুখ ইত্যাদি নিয়ে অনেকেই হাসপাতালে ভর্তি হন।

Air Quality Index বা AQI দিয়ে এই বায়ুদূষণের পরিমাণ নির্ধারণ করা যায়। সাধারণত AQI 100 পর্যন্ত সহ্য করা যায়। এর বেশি হলে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে।

শুধুমাত্র বাইরের নয়, ঘরের ভিতরের দূষণও চোখের ক্ষতি করে। অফিসের পুরানো ফাইলের ধুলো, এয়ারকন্ডিশন বা এসি মেসিনের শুষ্কতা এবং সিগারেটের ধোঁয়ার পার্টিকুলেট ম্যাটার চোখের জ্বালা, লাল হওয়া ইত্যাদি ঘটায়। প্লাইউডের তৈরি আসবাবপত্র থেকে ফরম্যাল ডিহাইডের বাষ্প নির্গত হয় তার থেকেও চোখের ভয়ানক উপদ্রব (irritation) হতে পারে। বেশিক্ষণ কম্পিউটার বা ডিজিটাল গ্যাজেটে কাজ করলে আমাদের চোখের বাইরেটা শুকনো বা dry হয়ে গিয়ে যে আই স্ট্রেন বা অস্বস্তি হয়, তাকে বলে ডিজিটাল আই স্ট্রেন বা কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোম। এছাড়া, বায়ুদূষণের কারণে আমাদের চোখের conjunctivitis জাতীয় ইনফেক্শন (infection) বা এলার্জি হয়।

দূষণের মাত্রা অনুযায়ী চোখের যে অসুবিধা হয় তা হল—

● চোখ কড়কড় করা, ● চোখ জ্বালা, ● চোখ লাল হওয়া, ● চোখের জল পড়া, ● নোংরা বা পিচুনি জমা, ● চোখ ফুলে যাওয়া, ● চোখ চুলকানি, ● ঘন ঘন চোখের পাতা ফেলা, ● চোখ শুকনো লাগা বা ড্রাইনেস, ● মাঝে মাঝে দৃষ্টি আবছা হয়ে যাওয়া।

পরিবেশ দূষণ কম বা বেশি থাকবেই এবং এরই মধ্যে আমাদের বাস করতে হবে। দৈনন্দিন কাজকর্মও করতে হবে। তাহলে আসুন দেখা যাক এরই মধ্যে আমরা কীভাবে আমাদের চোখের যত্ন নেব।

১। প্রোক্টেটিভ গ্লাস বা চশমা ব্যবহার করলে রোদের তাপ বা ধূলো ময়লা থেকে চোখ রক্ষা পাবে।

২। বাইরের পরিবেশ থেকে ঘুরে এসে ভালোভাবে পরিষ্কার জলে চোখ ধুয়ে ফেলতে হবে যাতে চোখের বাইরের ধুলো ময়লা যতটা সম্ভব পরিষ্কার হয়ে যায়।

৩। জ্বালা ভাব কমানোর জন্য পরিষ্কার রুমালের ভিতর বরফের কুচি নিয়ে বন্ধ চোখের উপর কোল্ড কম্প্রেস করলে আরাম পাওয়া যায়।

৪। যারা নিয়মিত কম্পিউটার ব্যবহার করেন, তাদের মাঝে মাঝে চোখকে বিশ্রাম দেওয়া এবং জলের ঝাপটা দেওয়া উচিত। কম্পিউটার ভিশন সিনড্রোম সম্পর্কে ইন্টারনেটে পড়ে নিলে উপকৃত হবেন।

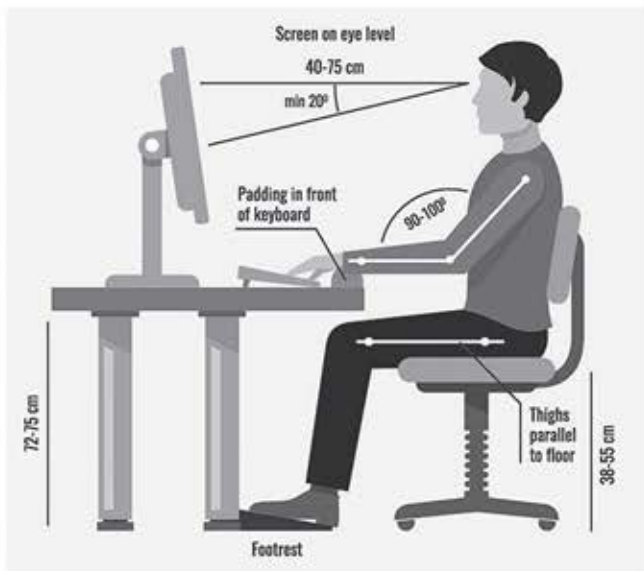

কম্পিউটারের সামনে সঠিক বসার ভঙ্গি

৫। শেষে হাতে রইল ওষুধ, যাকে বলা হয় Artificial tears বা Lubricating eye drops। বিভিন্ন ধরনের Lubricating eye drops পাওয়া যায় যা কর্ণিয়ার ওপরে tear বা চোখের জল বিকল্প (tear supplement) হিসাবে কাজ করে।

৬। পরীক্ষার সাহায্য চোখের শুষ্কতা বা dryness মেপে নেওয়া হয় এবং সেইমতো ওষুধের মাত্রা ঠিক করা হয়। Tear supplement eye drop লাগালে dryness-এর উপসর্গ থেকে অনেকটাই আরাম পাওয়া যায়।

৭। যারা দূষিত এলার্জির কারণে allergic conjunctivitis-এ কষ্ট পান, তারা anti allergic eye drop ব্যবহার করে ভালো থাকেন।

পরিবেশ দূষণ কম বা বেশি থাকবেই। এর থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন হতে পারব না এবং মাঝে মাঝেই 'চোখের বালি' অনুভব করব। এই পরিবেশ দূষণকে কমাবার জন্য দায়িত্বপূর্ণ নাগরিক হিসাবে আপনার আমার সকলের প্রচেষ্টারই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তাই সাবধানে থাকুন, পরিবেশের শুদ্ধতা রক্ষা করুন।

M. 9830213035

স্তন্যপায়ী

ড. রাজা রাউত

যারা হারিয়ে যাচ্ছে

বুনো মোষ

সাধারণ ইংরাজি নাম : Asian water Bufallo

বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Bubalus arnae*

আন্তর্জাতিক বিশ্ব বণ্যপ্রাণ সংস্থা আই. ইউ. সি. এন-এর লাল তালিকায় ১৯৮৬ সাল থেকে এরা বিপন্ন রূপে স্বীকৃত। বিশ্বেই আনুমানিক চার হাজার এই মুহূর্তে বেঁচে রয়েছে। এর মধ্যে ভারতেই প্রায় ৩১০০ এর মতো বেঁচে রয়েছে। বাংলাদেশ, লাওস, ভিয়েতনাম এবং শ্রীলঙ্কা থেকে এখন সম্পূর্ণ লুপ্ত।

ভারতে, প্রধানত উত্তরপূর্ব ভারতের কাজিরাঙ্গা, মানস, ডিব্রু সাইখাওয়া, লাওখাওয়া প্রভৃতি জাতীয় উদ্যানে আজও এদের দেখতে পাওয়া যায়।

সরিসৃপ

চর্মপৃষ্ঠ সামুদ্রিক কচ্ছপ

সাধারণ ইংরাজি নাম : Leatherback Sea Turtle

বিজ্ঞানসম্মত নাম : *Dermochelys coriacea*

পৃথিবীর বেঁচে থাকা সমস্ত কচ্ছপের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো এই কচ্ছপ পৃথিবীর একমাত্র প্রজাতি যার খোলক শক্ত চামড়া ও তৈলাক্ত মাংসপেশী দ্বারা আবৃত। অত্যন্ত প্রাচীন এই কচ্ছপের গড়-আয়ু কেউ বলেন ৩০ বছর, আবার কেউ বলেন ৫০ বছর আবার কেউ বলেন ১০০ বছর। গড়ে ওজন ২৫০ থেকে ৭০০ কি.গ্রা.। মোটামুটি ভারত মহাসাগর থেকে শুরু করে আলাস্কা থেকে নরওয়ে পর্যন্ত বিস্তৃত এদের আবাসস্থল। এরা তীব্রভাবে সংকটাপন্ন।

M. 9474417178 • email : rajarouthbhbl@gmail.com

সংবাদ

তিলাবনী পাহাড় বাঁচাতে পদযাত্রা

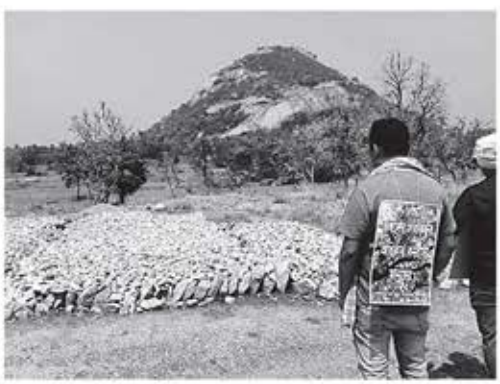

৬ এপ্রিল পুরুলিয়ার মাধবপুর থানার তিলাবনী পাহাড় বাঁচাতে, পদযাত্রা করল রাজ্যের পরিবেশকর্মীদের মুক্তপ্রবাহ 'দ্য গ্রিন ওয়াক'। পদযাত্রায় পা মেলান রাজ্যের বিভিন্ন জেলার চল্লিশজন পরিবেশকর্মী। 'তিলাবনী পাহাড় বাঁচাও কমিটি'র পক্ষ থেকে সদস্যরাও পা মেলান। পাহাড় বাঁচাও কমিটির স্বরূপ মাহাতো জানান, 'সরকার তিলাবনী পাহাড় কোম্পানীকে দিয়ে দিয়েছে গ্রানাইট পাথর খনন করার জন্য। সরকারের এই সিদ্ধান্ত আমরা মানব না।' তিলাবনী পাহাড়ের চারদিকে চারটি গ্রাম— তিলাবনী, পড়শিবনী, লেদাবনা ও মাধবপুর। গ্রাম চারটির মানুষের জীবন জীবিকার অনেকটা পাহাড়ের উপর নির্ভরশীল।

পদযাত্রীরা গ্রামগুলোতে ছোট ছোট সবুজ সভা করে। মানুষ পাহাড় ধ্বংসের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন। গ্রামের কচিকাঁচারাও এগিয়ে আসে। তারাও তাদের পাহাড় বাঁচাতে থাকতে চায় বড়োদের সঙ্গে। পদযাত্রার শেষে বিকেলে তিলাবনী গ্রামে শতাধিক গ্রামবাসীদের নিয়ে এক সভার আয়োজন করা হয়। তিলাবনী পাহাড়কে বাঁচানোর জন্য সদর্থক আলোচনা হয়।

তিলাবনী পাহাড় একা নয় যা ধ্বংসের মুখে, গোটা দেশময় তিলাবনী পাহাড় ছড়িয়ে আছে যা বিপন্ন। পাহাড় বাঁচানোর লড়াই জারি রাখতেই হবে, এই প্রতিজ্ঞা তিলাবনী পাহাড়ের মানুষেরা একসঙ্গে নিল।

বাংলার যমুনা নদীর জন্য পদযাত্রা

বিজ্ঞান দরবার, পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ, নদী বাঁচাও কমিটি ও বিজ্ঞান অন্বেষক পত্রিকা—এদের যৌথ উদ্যোগে তিন দিন ব্যাপী বাংলার যমুনা নদীর জন্য এক পদযাত্রার আয়োজন করা হয়।

১৯১৯ সালে প্রথম ও শেষবারের মতো পুরো যমুনা অববাহিকা সংস্কার করতে বাধ্য হয়েছিল ব্রিটিশ শাসকরা। গোবরডাঙ্গার জমিদার গিরিজা প্রসন্নের সঙ্গে হাজারো মানুষ সেদিন পথে নেমেছিলেন যমুনাকে বাঁচাতে। যমুনা আমাদের সকলের নদী। তাই এই যমুনা নদীকে বাঁচাতে পারলে আর্সেনিকের সমস্যা দূর হবে। পাশাপাশি চাষের উন্নতি হবে। এর ফলে সমাজ জীবনের প্রভূত উন্নতি হবে।

হরিনঘাটায় পদযাত্রা

হারিপুকুরিয়া বিদ্যালয়ে সচেতনতা শিবির

যমুনা নদী

যমুনা নদী সংস্কারের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও পরিবেশ কর্মীদের কিছু ভাবনা আপনাদের কাছে তুলে ধরছি। যথা :

১। যমুনার উৎসমুখ ভাগীরথীর সাথে মেশাতে হবে।

২। বাগের খাল সংস্কার করে যমুনাতে ভাগীরথীর জল প্রবেশ করাতে হবে।

৩। যমুনার পলি নদীর বুকে না ফেলে অন্যান্য উন্নয়ন মূলক প্রকল্পে ব্যবহার করা হোক।

৪। যমুনা সংস্কারের পাশাপাশি যমুনার শাখানদী ও উপনদীগুলির সংস্কার করা প্রয়োজন।

৫। যমুনাকে বাঁধাল (নদীর মাঝামাঝি বাঁশ, মশারী ও বালির বস্তা দিয়ে নদীর প্রবাহকে ২-৩ ফুটের মধ্যে আটকে দেওয়া) মুক্ত করতে হবে।

৬। আঞ্চলিক ভাবে মৃতপ্রায় যমুনা নদীর সীমানা নির্ধারণ করতে হবে।

৭। যমুনা নদীর তীরবর্তী শ্মশানগুলির সংস্কার করা প্রয়োজন।

৮। যমুনা নদী বাঁচাতে গেলে ইছামতি নদীর সংস্কার প্রয়োজন।

৯। যমুনা অববাহিকায় থাকা অসংখ্য বিল বাওরকে কেন্দ্র করে প্রচুর মৎস্যজীবীরা জীবনজীবিকা নির্বাহ করে। এই বিল-বাওর গুলির আশু সংস্কার করা প্রয়োজন।

১০। নদীর বুকে অবস্থিত ভেড়ি ও পুকুরগুলি বন্ধ করতে হবে।

১১। যমুনা-ইছামতি সংযোগস্থলে (মোহনা) বারবার মাটি তোলার ফলে নদী বক্ষ অপেক্ষা এই স্থানটি নিচু হয়ে যাওয়ায় বন্যার জল জমে যাচ্ছে। এই সমস্যা সমাধানে তেঁতুলিয়া ব্রিজের কাছে যমুনা সংস্কার করা প্রয়োজন।

১২। যমুনা তীরবর্তী অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে ফলের গাছ ও অন্যান্য গাছ লাগানো প্রয়োজন।

১৩। যমুনার উৎসমুখ থেকে মোহনা পর্যন্ত (সংযোগ স্থল) এই জলপথকে হেরিটেজ জলপথ হিসেব ঘোষণা করতে হবে।

১৪। নদীকে রক্ষা করার আমাদের দায়িত্ব। তাই এই নদীতে আবর্জনা ফেলা ও দখল বন্ধ করতে হবে।

১৫। নদীকে ব্যবহারের ধারণা ও পদ্ধতি পরিবর্তন করা প্রয়োজন।

যে পথে পদযাত্রা ও পথসভা হল—

১ম দিন (১৪ মার্চ) : হরিণঘাটা বাজার, কলেজ—ফতেপুর বাজার—হারিপুকুরিয়া হাই স্কুল—নগরউখরা হাই স্কুল—ঘোঁজা ছাত্র কল্যাণ সংঘ।

২য় দিন (১৫ মার্চ) : নহাটা পার্বতী খাল—নহাটা যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়—রামপুর আর. টি. আর. হাই স্কুল।

সংস্কারের কাজ চলছে

৩য় দিন (১৬ মার্চ) : রামপুর–গাইঘাটা–গোবরডাঙ্গা গবেষণা পরিষৎ।

পথযাত্রার সমাপ্তি অনুষ্ঠান

বিভিন্ন পথসভা, আলোকচিত্রসহ আলোচনা সভা ও বিদ্যালয়গুলিতে যমুনা নদী সংস্কারের দাবিগুলিকে তুলে ধরা হয়। শিক্ষক সুভাশিস বসু, প্রধান শিক্ষক সুশিতাভ ভট্টাচার্য, শিক্ষক মনোতোষ মিত্র, তপন সাহা, দীপক দাঁ, তাপস বিশ্বাস প্রমুখ সভায় বক্তব্য রাখেন। এছাড়া বিভিন্ন বিজ্ঞান ও পরিবেশ সংগঠনের পক্ষ থেকে বক্তারা নদীর উপযোগিতাকে তুলে ধরেন।

রতন দেবনাথ

কৃষ্ণ-গহ্বর : স্বপ্ন পূরণ

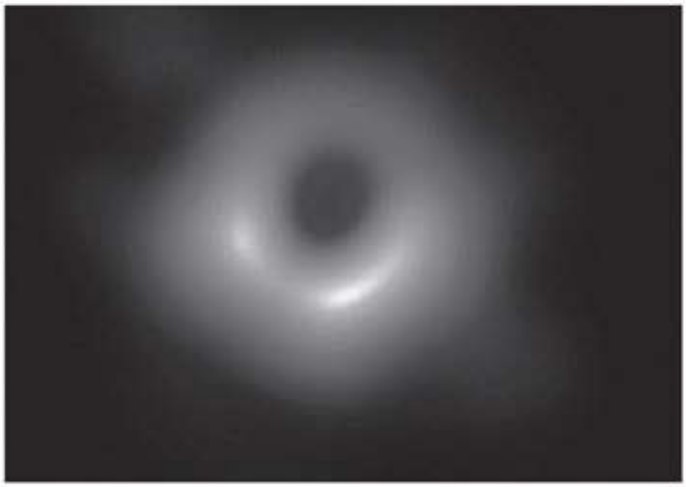

কৃষ্ণগহ্বরে প্রথম ছবি

দু'হাজার উনিশ সালের দশই এপ্রিল বিশ্ব মহাকাশ গবেষণায় ঘটে গেছে এক কালজয়ী বিপ্লব। বিজ্ঞানীদের কল্পনা পেয়েছে বাস্তব রূপ। ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণগহ্বর-এর বাস্তব ছবি দেখতে পেয়েছে মানুষ। এতদিন যা ছিল শুধু বিজ্ঞানীদের তত্ত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপ-এ পাওয়া কোটি কোটি তথ্য একত্রিত করে তুলে ধরা হয়েছে পৃথিবী থেকে পঞ্চান্ন মিলিয়ন আলোক বর্ষ দূরে ভার্গো নক্ষত্র মণ্ডলে মেসিয়ার ৮৭ (এম ৮৭) গ্যালাক্সির কেন্দ্রে এক কৃষ্ণ-গহ্বরের ছবি। যেন মহাকাশের ঈজেলে যান্ত্রিক তুলিতে জ্যোতির্বিদের কল্পনার রং-এ আঁকা।

কৃষ্ণ-গহ্বর কী?

আজ থেকে একশ বছরেরও বেশি আগে উনিশশো পনেরো সালে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন প্রকাশ করলেন তাঁর বিখ্যাত সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব বা জেনারেল থিয়োরি অফ্ রিলেটিভিটি। পাল্টে দিলেন স্থান-কালের ধারণা। বদলে গেল সারা পৃথিবীর চেহারাটাই। বললেন মহাকর্ষ কোনো বলই নয়, বরং স্থান-কালের বিকৃতি মাত্র। যা হয় কেবল ভরের কারণে। যে বস্তু ভর বেশি তা স্থান-কালকে বিকৃত করে তত বেশি। আইনস্টাইন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বে একটু নিরাশ ভাবেই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন এমন এক অদ্ভুত বস্তুর যার মাধ্যাকর্ষণ হবে অসীম মানের। স্থান-কালকেও যা করবে বিকৃত। রহস্যজনক অদ্ভুত সেই বস্তুই হল ব্ল্যাকহোল বা কৃষ্ণ-গহ্বর। অতীব ঘন এই বস্তুর মাধ্যাকর্ষণ থেকে মুক্তি নেই কারোর। এমনকী আলোও বাধা পড়ে সেখানে। আলোও যদি আটকে পড়ে কৃষ্ণ-গহ্বরে তাহলে তো তাকে চোখে দেখার প্রশ্নই আসে না। কৃষ্ণ-গহ্বরের চারপাশ ঘিরে থাকে ঘূর্ণায়মান আলোক নিঃসারী এক ধূলো-বালিকণা ও গ্যাসের আবরণ যার নাম অ্যাক্রিশন ডিস্ক। কৃষ্ণ-গহ্বরের মাঝের আংশটি থেকে কোনো আলোই বেরিয়ে আসতে পারে না। তাই এটি কালো। আর এজন্যই নাম কৃষ্ণ-গহ্বর। চারপাশের এই উজ্জ্বলতার প্রেক্ষাপটে মাঝের কালো অংশই কৃষ্ণ-গহ্বরের পরিচয় পত্র।

কৃষ্ণ-গহ্বর এতদিন পর্যন্তও ছিল কেতাবী বিষয়। তবে এর অস্তিত্ব সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা ছিলেন যথেষ্ট আশাবাদী। ১৯৩৫ সালে ভারতীয় বংশোদ্ভূত জ্যোতিঃপদার্থবিদ সুব্রহ্মনিয়াম চন্দ্রশেখর ইঙ্গিত দিয়েছিলেন এমন কিছু অতিকায় নক্ষত্রের, জীবনচক্রে যার পরিণতি হতে পারে কৃষ্ণ-গহ্বরে। ১৯৬৯-এ ইংরেজ জ্যোতির্বিদ ডোনাল্ড লিন্ডেন-বেল বলেছিলেন কৃষ্ণ-গহ্বরের কথা যা গ্যালাক্সিসমূহের কেন্দ্রে সৃষ্টি করে ব্যাপক পরিমাণ শক্তির। কৃষ্ণ-গহ্বরের ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও তার অস্তিত্বের সন্ধান করা ছিল এক দুরূহ ব্যাপার। কারণ এর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এতটাই বেশি যে এর থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না কোনও প্রকার আলোই। তাই মানুষের কাছে এটি থেকে গেছে অধরা। অথচ তত্ত্ব অনুসার প্রত্যেক গ্যালাক্সিরই কেন্দ্রে থাকার কথা কোন না কোন কৃষ্ণ-গহ্বরের। তাই কৃষ্ণ-গহ্বরের সন্ধান পেতে হলে নজর রাখতে হবে গ্যালাক্সির কেন্দ্রে। কেন্দ্রে নজর রাখলেই যে সমস্যার সমাধান হবে তাও নয়। কেননা আলো যার থেকে আসে না তাকে দেখবে কিভাবে? উপায়ও ঠিক করা হল। অ্যাক্রিশন ডিস্ক থেকে ঠিকরে পরা আলোক কাজে লাগিয়েই সন্ধান করা হবে কৃষ্ণ-গহবেরের। কৃষ্ণ-গহ্বরের মাত্রাতিরিক্ত মাধ্যাকর্ষণের কারণে যখন এর আশপাশ থেকে বস্তুসমূহ

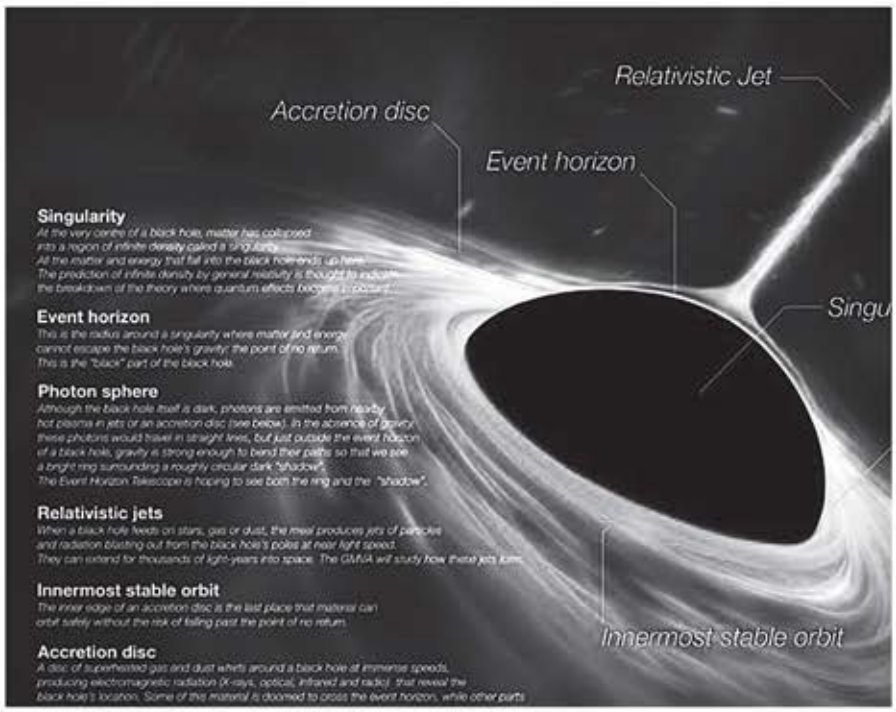

তার দিকে আসতে থাকে তখন তা সরাসরি কৃষ্ণ-গহ্বরের ভিতরে আসতে পারে না। বাদ সাধে ইভেন্ট হরাইজন।

ইভেন্ট হরাইজন কি?

ইভেন্ট হরাইজন যেন কৃষ্ণ-গহ্বরের চারপাশে এক লক্ষ্মণরেখা। যার ওপারে কোনো কিছুরই প্রবেশ নিষেধ। নিষেধ না মেনে ঢুকেছ তো মরেছ। ফিরে আসা আর হবে না। সে তুমি বস্তুই হও অথবা শক্তি। মাত্রাতিরিক্ত মাধ্যাকর্ষণের কারণে কৃষ্ণ-গহ্বর তার চারপাশের সমস্ত বস্তুকে তার কাছে টেনে নিলেও তা সরাসরি ইভেন্ট হরাইজনকে অতিক্রম করে যায় না। প্রথমে সেটি অ্যাক্রিশন ডিস্কে থেকে কৃষ্ণ-গহ্বরের চারপাশে চক্কর লাগাতে থাকে প্রায় আলোর বেগে। প্রচণ্ড ঘর্ষণে সৃষ্টি হয় তাপ। আর সেখানে চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে সেই তাপের পরিমাণ বেড়ে যায় অনেকগুণ। তৈরি হয় তীব্র আলো। তীব্র আলোয় ঘেরা মাঝের মিশকালো অন্ধকারকে নিশানা করেই খোঁজ চলে কৃষ্ণগহ্বরের।

প্রথমে পরিকল্পনা ছিল আমাদেরই গ্যালাক্সি মিল্কিওয়ের কেন্দ্রস্থিত স্যাজিটারিয়াস-এ কৃষ্ণ-গহ্বরটির সন্ধান করা হবে। কারণ এটিই আমাদের সবচেয়ে কাছে। কিন্তু দেখা গেল স্যাজিটেরিয়াস-এর তুলনায় পৃথিবী থেকে ৫৫ মিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরে থাকা মেসিয়া ৮৭ বা এম ৮৭ গ্যালাক্সি কেন্দ্রে থাকা কৃষ্ণ-গহ্বরকে সন্ধান বেশি সুবিধাজনক। কারণ, এম ৮৭ স্যাজিটোরিয়াস-এ এর তুলনায় আকারে অনেকগুণ বড়। দ্বিতীয়ত পৃথিবী এবং স্যাজিটেরিয়াসের মাঝে ধূলো-বালিকণা এত বেশি পরিমাণে রয়েছে যে, এই ধূলো-বালিকণা ভেদ করে তার ছবি নেওয়া বেশ মুশকিল। তাই ঠিক হল সন্ধান চালানো হবে এম ৮৭ গ্যালাক্সিতেই।

একটি সাধারণ তারার ছবি নেওয়া এবং কৃষ্ণ-গহ্বরের ছবি নেওয়ার মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক। একটি সাধারণ তারার ছবি নিতে টেলিস্কোপটিকে খুব বিশাল মাপের না হলেও চলে। কিন্তু কৃষ্ণ-গহ্বরের ছবি নিতে প্রয়োজন এক বিশালাকার টেলিস্কোপের। হিসাব করে দেখা গেছে, পৃথিবী থেকে অত দূরে থাকা এম ৮৭-এর ছবি নিতে গেলে যে টেলিস্কোপের প্রয়োজন তার আকার প্রায় আমাদের পৃথিবীর আকারের সমান হতে হবে। বোঝাই যায় এত বড়ো টেলিস্কোপ বানানো অসম্ভব। তাহলে উপায়?

হ্যাঁ, উপায়ও ভাবা হয়েছে বৈকি। ঠিক করা হল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসানো হবে কয়েকটি টেলিস্কোপ। তাক করা হবে এম ৮৭-র উপর। প্রতিটি টেলিস্কোপ থেকে সংগৃহীত তথ্যকে একত্র করে খাঁড়া করা হবে কৃষ্ণগহ্বরটির অবয়ব। এতে করে পৃথিবীর আবর্তন গতিকেও লাগানো যাবে কাজে। এর মাধ্যমে সেই একই কাজ হবে যা করত পৃথিবীর আকারের মাপের একটি বিশাল টেলিস্কোপ। জ্যোতির্বিদদের এই ভাবনার ফলই হল ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপ।

ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপ কোনো একক টেলিস্কোপ নয়। আটটি রেডিও টেলিস্কোপ বসানো হয়েছে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। হাওয়াই দ্বীপে একটি, মেক্সিকোতে একটি, আরিজোনা এবং স্পেনের সিয়েরা নেভাদার পর্বত শিখরে একটি করে, চিলির আটাকামার মরুপ্রান্তরে একটি এবং দক্ষিণমেরুতে একটি। প্রতিটি টেলিস্কোপ একটি আরেকটির সঙ্গে সময় সংযুক্তিতে আবদ্ধ পারমানবিক ঘড়ির সাহায্যে। যার ফলে টেলিস্কোপগুলি আলাদা আলাদা জায়গায় থেকেও একই সময়ে একক টেলিস্কোপের মতই কাজ করে। এসব নিয়েই হল ইভেন্ট হরাইজন টেলিস্কোপ। এক বছর সময় ধরে টেলিস্কোপগুলি এম ৮৭ কৃষ্ণ-গহ্বরে নজর রেখে সংগ্রহ করেছে ১.৩ মিলিমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রেডিও তরঙ্গ। সবকটি টেলিস্কোপ মিলে যে তথ্য সংগ্রহ করেছে তার পরিমানও ব্যাপক। প্রায় দু'বছর ধরে দুশো জনেরও বেশি বিজ্ঞানীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সংগৃহীত সমস্ত তথ্যসমূহ সুপার কম্পিউটারে প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে পাওয়া গেল এম ৮৭ কৃষ্ণ-গহ্বরের যে ছবি তা পৃথিবীবাসী দেখল ১০ই এপ্রিল ২০১৯। কৃষ্ণ-গহ্বরের 'প্রথম ছবি'। তত্ত্বের সঙ্গে যার হুবহু মিল।

M. 9477934928 ● email : rdebnath1961@gmail.com

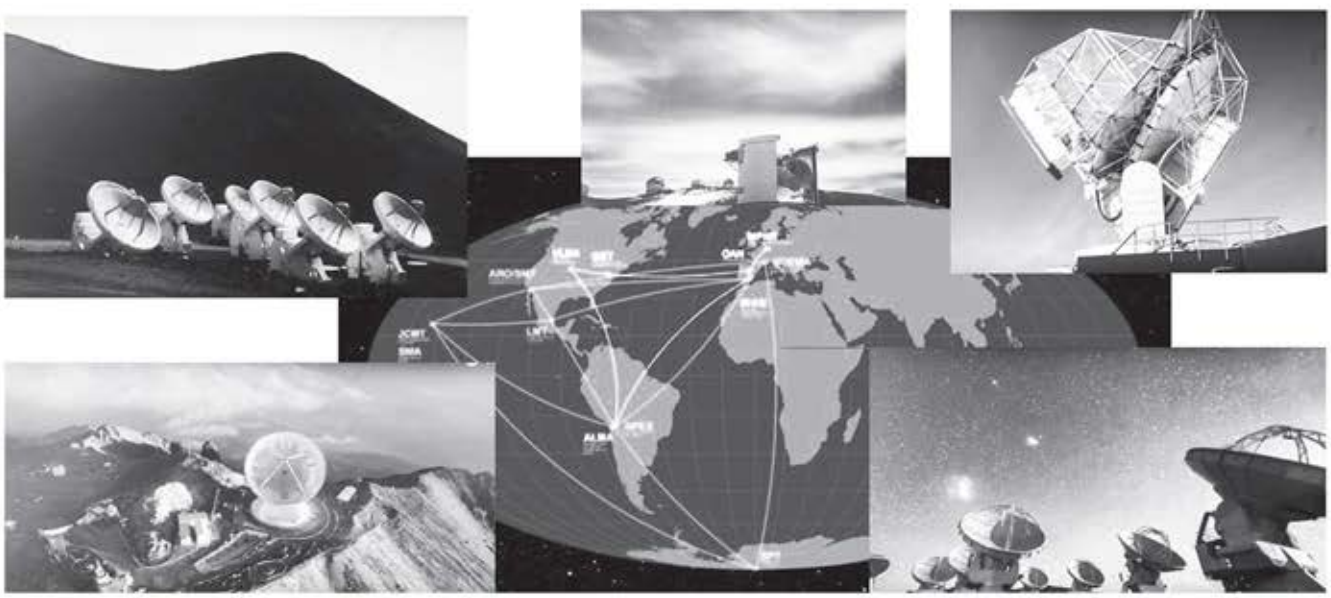

বিজয় সরকার

জানো কি?

❑ হল ঘরে বা পাহাড়ের উপর আওয়াজ করলে প্রতিধ্বনি শোনা যায় কেন?

একবার শব্দ করার অল্প কিছুক্ষণ পর একই আওয়াজ যদি আবার শোনা যায়, তাকে বলা হয় প্রথম শব্দের প্রতিধ্বনি। শব্দের প্রতিফলনের জন্য এমনটা ঘটে থাকে। কোন শব্দের অনুভূতির রেশ আমাদের মস্তিষ্কে ১ সেকেন্ডের ১০ ভাগের ১ ভাগ সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয়। সুতরাং প্রতিধ্বনি শুনতে হলে উৎস থেকে তৈরি হওয়া ও প্রতিফলিত শব্দ, এই দুয়ের মধ্যে কমপক্ষে ০.১ সেকেন্ড সময়ের ব্যবধান থাকতে হবে। বাতাসে শব্দের গতিবেগ সেকেন্ডে ৩৪৪ মিটার (২২°C উষ্ণতায়)। অর্থাৎ উৎস থেকে বেরোনোর পর শব্দ ০.১ সেকেন্ডে ৩৪.৪ মিটার পথ অতিক্রম করতে পারে। ফলে ঠিকঠাক প্রতিধ্বনি শুনতে হলে উৎস থেকে শব্দ সৃষ্টি হয়ে যে বস্তুতে বাঁধা পাচ্ছে তার দূরত্ব হতে হবে অন্ততপক্ষে ৩৩.৪/২ = ১৭.২ মিটার বা ৫৬ ফুট। তাই হল ঘরের দুই দেওয়ালের দূরত্ব ৫৬ ফুট না হলে প্রতিধ্বনি শোনা যাবে না। এই দূরত্ব অবশ্য তাপমাত্রা ভেদে পরিবর্তিত হয়। প্রতিধ্বনি একাধিক বারও শোনা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে শব্দ যে বস্তুতে প্রতিফলিত হবে তার সংখ্যাও একাধিক হবে। বজ্রপাতের সময় এবং পাহাড়ের চূড়ায় আওয়াজ করলে আমরা এমনটা শুনি। প্রতিধ্বনির সাহায্যে অংক কষে শব্দের উৎস থেকে প্রতিফলনকারী বস্তুর দূরত্ব নির্ণয় করা যায়। সূত্রটি হবে এইরকম— শব্দের গতিবেগ × সময়/২।

❑ আলো থেকে হঠাৎ অন্ধকারে এলে প্রথমটায় কিছু দেখা যায় না কেন?

মানুষের চোখ এমন এক অসাধারণ সংবেদনশীল কোষগুচ্ছ দিয়ে তৈরি, তা যেমন তীব্র আলোতে দেখতে পারে, তেমনি আবার প্রায় অন্ধকারে দেখতে পারে। আলো অনুভব করার জন্য চোখের পর্দা বা রেটিনায় আছে দু'ধরনের কোষ— রড ও কোন কোষ। চড়া আলোয় দেখা বা রঙের অস্তিত্ব ধরতে পারে কোন কোষ। আর রড কোষ কম আলোয় সাদাকালো দৃশ্য দেখতে পারে। আমরা যখন কোনো অন্ধকার ঘরে ঢুকি, প্রথমে চোখে কিছু দেখা যায় না, কারণ যথেষ্ট আলো না থাকলে কোন কোষ কার্যকর হয় না। আর রড কোষগুলির সক্রিয় হয়ে উঠতে কিছুটা সময় লাগে। আলো-আঁধারের ততক্ষণ আমাদের ধাঁধা লেগে থাকে, অভ্যস্ত হতে চোখের কিছুটা সময় লাগে।

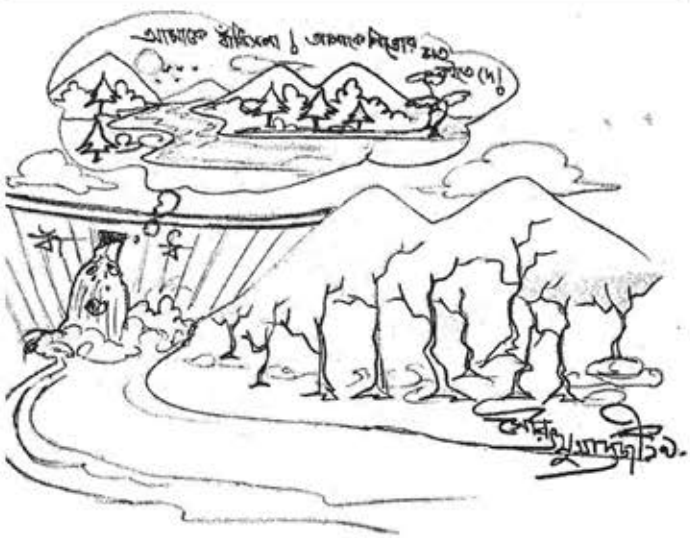

কার্টুন : সৌরভ মুখার্জী M. 9830470334

পত্রিকা যোগাযোগ

জলপাইগুড়ি সায়েন্স অ্যান্ড নেচার ক্লাব M. 9232387401 • প্রতাপদীঘি লোকবিজ্ঞান সংস্থা M. 9732681106 • কলকাতা বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা M. 9477589456 • তপন চন্দ, মাদারীহাট, আলিপুরদুয়ার M. 9733153661 • কোচবিহার বিজ্ঞান চেতনা ফোরাম M. 9434686749 • গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎ M. 9593866569 • পরিবেশ বান্ধব মঞ্চ, বারাকপুর M. 9331035550 • জয়ন্ত ঘোষাল, নৈহাটি M. 8902163072 • কুন্তাল দে, ঝাড়গ্রাম M. 9474306252 • নন্দগোপাল পাত্র, পূর্ব মেদিনীপুর M. 9434341156 • উৎপল মুখোপাধ্যায়, বারাসাত M. 9830518798 • ভোলানাথ হালদার, বনগাঁও M. 8637847365 • শিয়ালদহ ও যাদবপুর স্টেশন, বৈচিত্র্য, পাতিরাম, ধ্যানবিন্দু ও মনীষা (কলেজ স্ট্রিট)।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক জয়দেব দে কর্তৃক ৫৮৫ অজয় ব্যানার্জী রোড (বিনোদনগর) পো : কাঁচরাপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক স্ক্রীন আর্ট, ২০ নেতাজী সুভাষ পথ, পো : কাঁচরাপাড়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা থেকে মুদ্রিত।
অক্ষর বিন্যাস : রেজ ডট কম, ৪৪/১এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯ ● সম্পাদক : তাপস মজুমদার। ফোন : ৯৮৭৪৭৭৮২১৬/৯৪৭৪৩৩০০৯২
সম্পাদকমণ্ডলী : বিজয় সরকার, প্রবীর বসু, শিবপ্রসাদ সর্দার, সম্রাট সরকার, অনুপ হালদার, সুজয় বিশ্বাস
e-mail : bijnandarbar1980@gmail.com/ganabijnan@yahoo.co.in, Whatsapp No. 8240665747, website : www.ssu2011.com/bigyan-anneswak